শ্রমিক

শ্রমিক

Sramik: A BILS Journal, July-December 2015

জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৫

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ

মেসবাহউদ্দীন আহমেদ

মো: মজিবুর রহমান ভূঞা

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

রায় রমেশ চন্দ্র

প্রধান সম্পাদক

নজরুল ইসলাম খান

সম্পাদক

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

ব্যবস্থাপনা

এম এ রহমান

সহকারী সম্পাদক

ফারিবা তাবাসসুম

মুদ্রণ

সারকো মিডিয়া এইড সার্ভিসেস

৮৫/১, সাফেয়েতউল্লাহ লেন, ফকিরাপুল

ঢাকা-১০০০

প্রকাশক

ফ্রেডরিক ইবার্ট স্টিফটাং-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

(Supported by Friedrich Ebert Stiftung -FES)

বাড়ি: ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা. ফোন ৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১১৬৫৫৩

ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০ ই-মেইল: bils@citech.net ওয়েব: www.bils-bd.org

ISSN : 2224-1817

সম্পাদকীয়

বিল্‌স জার্নাল শ্রমিক-এর বিশেষ সংখ্যা হিসেবে এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে। সাধারণত একটি একাডেমিক জার্নালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লেখা দিয়েই প্রকাশিত হয়। যদিও শ্রমিকের বিভিন্ন সংখ্যায় আমরা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে নবীনদের লেখা ছাপিয়েছি। কিন্তু তারা সবাই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক অথবা গবেষক ছিলেন।

নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ গবেষকদের শ্রম ইস্যুতে সম্পৃক্ত করা এবং ভবিষ্যতে শ্রম ইস্যু নিয়ে গবেষণা কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিল্‌স-এ ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিল্‌স-এ বিভিন্ন ইস্যুতে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করে থাকে। এই ইন্টার্নশিপের শিক্ষার্থীদের গবেষণার প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি প্রতিবেদন নির্বাচন করে এই বিশেষ সংখ্যাটি করা হয়েছে। এখানে নির্বাচনের মানদণ্ড ধরা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রান্তিক শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী নিয়ে কৃত কয়েকটি প্রতিবেদন। এক্ষেত্রে গবেষণা বা প্রতিবেদনের মানকে মুখ্য ধরা হয়নি, বরঞ্চ যে সকল শ্রমজীবী গোষ্ঠী আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলাফেরা করলেও তাদের জীবনের হাসি, কান্না, সংকট, সমস্যা দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায় এবং খুব কম সময়ই একাডেমিক গবেষকগণ উৎসাহিত হন এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে। নবীনদের চোখে শ্রমিকদের এমন কিছু সমস্যাকেই এই প্রতিবেদনগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা নীতিনির্ধারক ও প্রতিষ্ঠিত গবেষকগণ এ ব্যাপারে আরো গভীরভাবে গবেষণাকাজে উৎসাহিত হবেন।

জার্নালের এই বিশেষ সংখ্যাটি মূলত নবীনদের চোখে শ্রমকে দেখা হয়েছে। খুব বেশি পরিবর্তন করা হয়নি, একধরনের সম্পাদনা ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকা, উপসংহার দেয়া হয়নি। শুধু তাদের গবেষণাকাজটি তুলে ধরা হয়েছে।

সূচিপত্র

- ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স পোশাক কারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থান ও অবস্থার উন্নয়নে করণীয়: কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-ভিত্তিক একটি গবেষণা ৭-১৭
  মোসা. মাহ্জুবা উম্মে ফেরদৌসী
- বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার বর্তমান অবস্থা ও করণীয় ১৮-৩৭
  রত্না বেগম
- আদিবাসী মেয়েদের বিউটি পার্লারে আগমন, তার কারণ এবং বর্তমানে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৩৮–৪৬
  হাসান আল আব্দুল্লাহ
- হবিগঞ্জে চা-শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ ৪৭–৫৭
  সৈয়দ মোশারফ হোসেন
- গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ: কারণ, প্রভাব ও উত্তরণের উপায়: একটি সমীক্ষা ৫৮–৭৭
  কাওসার হোসাইন
- কাঠ-শিল্পশ্রমিকদের ওপর পরিচালিত গবেষণা ৭৮–৮৮
  মো: আরিফুর রহমান
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের শ্রম অধিকার সচেতনতা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা ৮৯–১০৪
  কানিজ ফাতেমা খান
- æVulnerability Assessment And After Award Services" For Rana Plaza Survivors And Their Family Members ১০৫–১০৮
  শারমিন আক্তার

ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স পোশাক কারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থান ও অবস্থার উন্নয়নে করণীয়: কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-ভিত্তিক একটি গবেষণা

–মোসা. মাহ্জুবা উম্মে ফেরদৌসী

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে তৈরি পোশাকশিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষত তৈরি পোশাকশিল্প রপ্তানি খাতের শীর্ষে অবস্থান করে বিগত কয়েক দশক ধরে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। আর এ তৈরি পোশাকশিল্পের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ হলো ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স কারখানা। এ ধরনের শত শত কারখানা ছড়িয়ে আছে ঢাকা ও এর আশপাশের কয়েকটি এলাকায়। এসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিকেরা অধিকাংশই অল্পবয়স্ক নারী ও পুরুষ। যদিও তৈরি পোশাকশিল্পের প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখতে ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা কঠোর পরিশ্রম করছে। তার পরও এসব শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি, সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে । ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবস্থিত দশটি ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স কারখানা ও পোশাকশ্রমিকের ওপর জরিপ চালিয়ে এসব তথ্য পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই অত্যন্ত কম মজুরিতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করছে। এসব কারখানায় কর্মরত নারীশ্রমিকেরা মাতৃত্বকালীন অবকাশ উপভোগের সুযোগ হতে বঞ্চিত। শ্রম আইন অনুযায়ী কোনো কারখানায় চাকরির মেয়াদ ৬ মাস পূর্ণ হলে নারীশ্রমিকের প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা ভোগ করতে পারেন, অর্থাৎ কোনো নারীশ্রমিক তার সন্তান প্রসবের আগে ৮ সপ্তাহ ও পরে ৮ সপ্তাহ মোট ১৬ সপ্তাহ বেতনসহ এ ছুটি ভোগ করতে পারেন। কিন্তু এসব কারখানার নারীশ্রমিকরা গর্ভবতী হলে তাদেরকে বিনা বেতনে ছুটি কাটাতে হয় অথবা কাজ হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স কারখানাতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর পরিচালিত বর্তমান গবেষণা এ সকল কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে। এর ফলে ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা দৈন্য-দুর্দশা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে এবং সকল উৎস হিসেবে কাজ করবে। গবেষণার তথ্য সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া শ্রমিকেরাও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণা এলাকার শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে জানা এবং শ্রমিক অধিকার পূরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করা এ গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য। এছাড়া এই গবেষণার জানার উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে কি না তা জানা।

- শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন কতটুকু প্রয়োগ হচ্ছে তা জানা।
- শ্রমিকদের মানবাধিকার কতটুকু পূরণ হচ্ছে তা জানা।
- শ্রমিকদের কারখানার অবস্থা সম্পর্কে জানা।
- শ্রমিকদের কর্মস্থল কতটুকু স্বাস্থ্য, নিরাপদ ও কর্ম-উপযোগী তা সম্পর্কে জানা।

গবেষণা এলাকা ও তথ্য সংগ্রহের নমুনা নির্ধারণ

গবেষণা এলাকা হিসেবে ঢাকা-কেরানীগঞ্জ এলাকায় গড়ে ওঠা ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স কারখানা রয়েছে। সেই এলাকাকে সামগ্রিক হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কেরানীগঞ্জ এলাকাকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১. কালীগঞ্জ
২. তেলঘাট
৩. আলিনগর, কালীগঞ্জ
৪. নামাপাড়া
৫. কলাতিয়া

এই পাঁচটি এলাকা হতে ১০টি করে ২৫ জন নারী ও ২৫ জন পুরুষ মোট ৫০ জন পোশাকশ্রমিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি ও প্রতিটি এলাকার ২টি কারখানার মালিকসহ মোট ১০টি কারখানার মালিকের কাছ থেকে কারখানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলি

ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স পোশাক কারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে করণীয়: কেরানীগঞ্জ, ঢাকাভিত্তিক একটি গবেষণা। কারখানার শ্রমিক-সম্পর্কিত টেবুলেশন।

সারণি-১ : জিন্স কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বয়স

শ্রমিকদের বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা
১০-২০	১৯	৩৮%
২০-৩০	২৩	৪৬%
৩০-৪০	৭	১৪%
৪০-৫০	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উল্লিখিত সারণিতে মোট শ্রমিক ৫০ জন, যাদের মধ্যে ২০ থেকে ৩০ বছরের শ্রমিকদের বয়সের হার বেশি। যার গণসংখ্যা ২৩, শতকরা হার ৪৬ এবং ৪০-৫০ বছরের শ্রমিকদের বয়সের হার সর্বনিম্ন, যার গণসংখ্যা ১ এবং শতকরা ২।

সারণি- ২ : শ্রমিকদের বৈবাহিক অবস্থা-সম্পর্কিত সারণি

বৈবাহিক অবস্থা	শ্রমিকসংখ্যা (গণসংখ্যা)	শতকরা হার
বিবাহিত	২২	৪৪
অবিবাহিত	২৮	৫৬
মোট	৫০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে মোট ৫০ শ্রমিকের মধ্যে ২২ জন বিবাহিত, যা শতকরা ৪৪ ও ২৮ জন শ্রমিক অবিবাহিত, যা শতকরা ৫৬।

সারণি-৩ : শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পর্কিত সারণি

শ্রমিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা	শ্রমিকসংখ্যা (গণসংখ্যা)	শতকরা হার
শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই (০)	০৪	৮
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ)	২৬	৫২
মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ (ষষ্ঠ থেকে এস.এস.সি পাশ)	২০	৪০
মোট	৫০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে মোট শ্রমিক ৫০ জন যার মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই ০৪ জনের, যা মোট শ্রমিকের ০৮% । প্রাথমিক শিক্ষা আছে ২৬ জনের, যা শতকরা ৫২। শ্রমিকদের মধ্যে বেশিসংখ্যক শ্রমিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

সারণি-৪ : শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যসংখ্যার সারণি

শ্রমিকের পরিবারের সদস্যসংখ্যা	শ্রমিকসংখ্যা (গণসংখ্যা)	শতকরা হার
২-৪	১০	২০
৪-৬	৩৫	৭০
৬-৮	০৫	১০
মোট	৫০	১০০

উল্লেখিত সারণিতে মোট ৫০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩৫ জন শ্রমিকের পরিবারের সদস্য (৪-৬) জন, যা শতকরা ৭০ ও ৫ জন শ্রমিকের পরিবারের সদস্য (৬-৮) জন, যা শতকরা ১০।

সারণি-৫ : শ্রমিকদের কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ধরন-সম্পর্কিত সারণি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	কারখানার সংখ্যা (গণসংখ্যা)	শতকরা হার
দেশীয়	৫০	১০০
রপ্তানিমুখী	০	০
মোট	৫০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে মোট ৫০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৫০টি কারখানা দেশীয়, যা শতকরা ১০০।

সারণি-৬ : কারখানায় শ্রমিকদের পদবি সম্পর্কিত সারণি

প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পদবি	শ্রমিকের সংখ্যা (গণসংখ্যা)	শতকরা হার
হেলপার	২	০৪
কাটার হেলপার	০	০
অপারেটর	৪৬	৯২
কাটারম্যান	২	০৪
ফিনিশিং ম্যান	০	০
প্যাকিং ম্যান	০	০
মোট	৫০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে ৫০ জন শ্রমিকের মধ্যে হেলপার ২ জন, যার শতকরা হার ০৪ অপারেটর ৪৬ জন, যার শতকরা হার ৯২ এবং ক্যাটারম্যান ২ জন, যার শতকরা হার ৪।

সারণি-৭ : প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের কাজের সময়

কাজের সময়	শ্রমিকের সংখ্যা (গণসংখ্যা)	শতকরা হার
১০-১২	৩৫	৭০
১২-১৪	১৫	৩০
১৪-১৬	০	০
মোট	৫০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে ১০-১২ ঘণ্টার শ্রেণি ব্যবধানে গণসংখ্যা ৩৫, যার শতকরা হার ৭০ এবং ১২-১৪ ঘণ্টার শ্রেণি ব্যবধানে গণসংখ্যা ১৫, যার শতকরা হার ৩০।

সারণি-৮ : কাজের চুক্তির ধরণ-সম্পর্কিত সারণি

চুক্তির ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা
মাসিক	৩২	৬৪
সাপ্তাহিক	১৫	৩০
দৈনিক	০	০
অর্ডার-ভিত্তিক (প্রোডাকশন)	০৩	৬
মোট	৫০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায় মোট ৫০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩২ জন শ্রমিক মাসিকভিত্তিক কাজ করে, যা শতকরা ৬৪ এবং অর্ডার-ভিত্তিক ৩ জন শ্রমিক, যার শতকরা হার ৬।

সারণি-৯ : প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বেতন

শ্রমিকদের বেতন	গণসংখ্যা	শতকরা
২০০০-৩০০০	১৬	৩২
৪০০০-৫০০০	৩১	৬২
৬০০০-৭০০০	২	৪
৮০০০-৯০০০	১	২
মোট	৫০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে শ্রেণি ব্যবধান ৪০০০-৫০০০-এর শতকরা হার ৬২ এবং ৮০০০-৯০০০ এর শতকরা হার ২। এছাড়া শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন ২০০০ ও সর্বোচ্চ বেতন ৮০০০ টাকা।

অতএব সর্বোচ্চ বেতন ৮০০০

সর্বনিম্ন বেতন (-) ২০০০

৬০০০/২ = ৩০০০/-

অতএব শ্রমিকের গড় বেতন ৩০০০/-।

সারণি-১০ : মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা

মাতৃত্বকালীন ছুটি	শ্রমিকের সংখ্যা (গণসংখ্যা)	শতকরা হার
আছে	০	০
নাই	৫০	১০০
মোট	৫০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা থেকে দেখা যায়, শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির কোনো ব্যবস্থা নেই।

ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স পোশাক কারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে করণীয় : কেরানীগঞ্জ, ঢাকাভিত্তিক একটি গবেষণা। কারখানার শ্রমিক-সম্পর্কিত টেবুলেশন।

সারণি-১ : কারখানার ধরন-সম্পর্কিত সারণি

কারখানার ধরন	কারখানার সংখ্যা (গণসংখ্যা)	শতকরা
দেশীয়	১০	১০০
রপ্তানিমুখী	০	০
মোট	১০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে ১০টি কারখানার মধ্যে ১০টি কারখানা দেশীয়, যা শতকরা ১০০ ও রপ্তানিমুখী কারখানা ০ যা শতকরা ০ বলা যায় অধিকাংশ কারখানা দেশীয় বাজারের ওপর নির্ভরশীল।

সারণি-২ : কারখানায় কর্মরত শ্রমিকসংখ্যা

কারখানা	পুরুষ	নারী	মোট (শ্রমিক)
১ম	১২	০৪	১৬
২য়	১০	০৪	১৪
৩য়	০৮	০৩	১১
৪র্থ	১৪	০২	১৬
৫ম	১৪	০১	১৫
৬ষ্ঠ	১০	০৩	১৩
৭ম	১০	০৩	১৩
৮ম	০৬	০৩	০৯
৯ম	১৩	০৪	১৭
১০ম	১৮	০৭	২৫
মোট	১১৫	৩৪	১৪৯

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায়, ১০টি কারখানায় শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ১৪৯ জন যার মধ্যে পুরুষ শ্রমিক ১১৫ জন ও নারী শ্রমিক ৩৪ জন। অতএব, নারীশ্রমিকের তুলনায় পুরুষশ্রমিকের সংখ্যা বেশি।

সারণি-৩ : নারী ও পুরুষশ্রমিকের সংখ্যা

শ্রমিক	সংখ্যা (জন)	কারখানা (টি)	গড়	শতকরা
নারী	৩৪	১০	৩.৪	২২.৮২
পুরুষ	১১৫		১১.৫	৭৭.১৮
মোট শ্রমিক	১৪৯	১০		১০০

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায় ১০টি কারখানায়, ৩৪ জন নারীশ্রমিক রয়েছে, যাদের গড় ৩.৪ জন ও শতকরা ২২.৮২ ও পুরুষ ১১৫ জন, শ্রমিকের গড় ১১.৫ জন, যা শতকরা ৭৭.১৮। অতএব, ১০টি কারখানায় পুরুষশ্রমিক নারীশ্রমিকের তুলনায় বেশি।

সারণি-৪ : কারখানায় শ্রমিকের ধরন হিসাবে শতকরা

শ্রমিকদের পদবি	মোট সংখ্যা (জন)	কারখানা (টি)	শতকরা হার
হেলপার	১৪	১০	৩.৩৯
কাটার হেলপার	০২		১.৩৪
অপারেটর	১২১		৮১.২০
কাটারম্যান	১০		৬.৮১
ফিনিশিং ম্যান	০২		১.৩৪
প্যাকিং ম্যান	০		০
মোট	১৪৯		১০০

সারণিতে ১৪৯ জন শ্রমিকের মধ্যে অপারেটর ১২১ জন, যার শতকরা হার ৮১.২০। অতএব শ্রমিকদের মধ্যে অপারেটরের সংখ্যা বেশি।

সারণি-৫ : কারখানার আয়তন-সম্পর্কিত সারণি

কারখানা	কারখানার দৈর্ঘ্য (ফুট)	প্রস্থ (ফুট)	ক্ষেত্রফল (বর্গফুট)
১ম	২৮	২০	৫৬০
২য়	৩০	২৪	৭২০
৩য়	৩৬	২৮	১০০৮
৪র্থ	২৪	২০	৪৮০
৫ম	৪০	৩২	১২৮০
৬ষ্ঠ	৩০	২৮	৮৪০
৭ম	৩০	১৫	৪৫০
৮ম	২০	২০	৪০০
৯ম	৩০	২৪	৭২০
১০ম	৩২	৩২	১০২৪
মোট	৩০০	২৪৩	৭৪৮২
গড়	৩০	২৪.৩	৭৪৮.২

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায়, ১০টি কারখানার মোট আয়তন ৭৪৮২ বর্গফুট এবং দৈর্ঘ্য ৩০০ ফুট ও প্রস্থ ২৪৩ ফুট। অতএব, গড় দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট, প্রস্থ ২৪.৩ ফুট এবং গড় ক্ষেত্রফল ৭৪৮.২ বর্গফুট।

সারণি-৬ : কারখানার পয়োনিষ্কাশন-ব্যবস্থাসম্পর্কিত সারণি

কারখানার	কারখানার নিজস্ব	একাধিক কারখানার জন্য

টয়লেট					
কারখানা নং	পুরুষ (টি)	মহিলা (টি)	যৌথ (টি)	কারখানার সংখ্যা (টি)	টয়লেট সংখ্যা (টি)
১ম	০	০	২	০	০
২য়	০	০	১	০	০
৩য়	১	১	০	০	০
৪র্থ	০	০	১	০	০
৫ম	০	০	১	০	০
৬ষ্ঠ	০	০	০	৬	২
৭ম	০	০	০	৮	৩
৮ম	০	০	১	-	০
৯ম	০	০	০	৯	৩
১০ম	০	০	১	০	০
মোট	১	১	৭	২৩	৮
শতকরা হার	১০	১০	৭০	-	৮০

উল্লিখিত সারণিতে ১০টি কারখানার মধ্যে কারখানার =য়োনিষ্কাশন নিজস্ব ব্যবস্থা আছে, যার শতকরা হার ১০ এবং মহিলাদের জন্য টয়লেট আছে শতকরা হার ১০ এবং যৌথ টয়লেটের শতকরা হার ৭০। আরও মোট ২৩টি কারখানায় টয়লেট আছে মাত্র ৪টি।

সারণি-৭ : নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাসম্পর্কিত সারণি

নিরাপদ পানীয় জল	কারখানা (গণসংখ্যা)	শতকরা
আছে	১০	১০০
নাই	০	০
মোট	১০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায়, ১০টি কারখানায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে, যা শতকরা ১০০। কারণ তারা নিরাপদ নলকূপের পানি পান করে।

সারণি-৮ : কারখানার আলো-বাতাসের ব্যবস্থাসম্পর্কিত সারণি

কারখানা	ভেন্টিলেটর	জানালা	দরজা
১ম	১	৩	১
২য়	০	২	১
৩য়	০	২	১
৪র্থ	০	৪	১
৫ম	২	৩	১
৬ষ্ঠ	০	৩	১
৭ম	০	৩	১
৮ম	০	২	১
৯ম	২	৩	১
১০ম	৩	৩	১
মোট	৮	২৮	১০

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায়, ১০টি কারখানায় ভেন্টিলেটর আছে ৮টি, জানালা আছে ২৮টি এবং দরজা আছে ১০টি।

সারণি-৯ : কারখানার নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থা

নিরাপত্তাব্যবস্থা	কারখানা সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা
আগুন নেভানোর যন্ত্র	১০	০	০
বিকল্প সিঁড়ি		০	০
মোট	১০	০	০

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায়, ১০টি কারখানার কোনোটিতেই আগুন নেভানোর যন্ত্র ও বিকল্প সিঁড়ির ব্যবস্থা নেই।

সারণি-১০ : শ্রমিকের সংখ্যা ও চুক্তির ধরন-সম্পর্কিত সারণি

কারখানা নং	শ্রমিকের কাজের ধরন			মোট
	স্থায়ী	অস্থায়ী	চুক্তিভিত্তিক	
১ম	১	৫	১০	১৬
২য়	০	১১	০	১১
৩য়	১	৩	১০	১৪
৪র্থ	৩	১৩	০	১৬
৫ম	১	৫	৯	১৫
৬ষ্ঠ	১	২	১০	১৩
৭ম	১	১১	১	১৩
৮ম	১	২	৬	৯
৯ম	১	১৬	০	১৭
১০ম	১	১৪	১০	২৫
মোট	১১	৮২	৫৬	১৪৯
শতকরা	৭.৪৮	৫৫.০৩	৩৭.৫৮	১০০

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায় ১০টি কারখানায় ১৪৯ জন শ্রমিকের মধ্যে স্থায়ী ১১ জন, যা শতকরা ৭.৪৮, অস্থায়ী ৮২ জন শতকরা ৫৫.০৩, চুক্তিভিত্তিক ৫৬ জন, শতকরা ৩৭.৫৮ জন। সুতরাং অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি।

কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের থেকে সংগ্রহকৃত তথ্যের মধ্যে ব্যবধান:

কারখানার শ্রমিক ও মালিকদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যে সকল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, সে সকল উপাত্তের মধ্যে শ্রমিকদের অধিকার-সম্পর্কিত পার্থক্য দেখা যায়, যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

- ❖ কারখানার মালিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে শ্রমিকদের মাসিক গড়ে ৩৫০০ টাকা মজুরি হিসেবে প্রদান করা হয়। অন্যদিকে শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মাসিক গড় মজুরি ৩০০০ টাকা। তবে শ্রমিকদের মধ্যে হেলপার কম মজুরি নিয়ে কাজ করে।
- ❖ কারখানার মালিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে শ্রমিকদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় হিসেবে ১১ ঘণ্টা কাজ করতে হয় কিন্তু শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে শ্রমিকদের ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়।
- ❖ কারখানার মালিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে ২০% কারখানার মালিক দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে কিন্তু শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মাত্র ১৬% শ্রমিক ক্ষতিপূরণজনিত সুবিধা ভোগ করতে পারে।
- ❖ উল্লিখিত ব্যবধানসমূহ মালিক ও শ্রমিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত উপাত্তে পাওয়া যায়।

গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত মূল্যায়ন

বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষ তার মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য শ্রমজীবী মানুষ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো কেরানীগঞ্জ এলাকার জিন্স তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ সকল শ্রমিকরা যে সকল কারখানায় নিয়োজিত রয়েছে, সে সকল কারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থা ও অবস্থার উন্নয়নে করণীয় শিরোনামে গবেষণার জন্য সংগ্রহকৃত উপাত্তকে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিভিন্ন ধারার আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬

বাংলাদেশ শ্রম আইনে পোশাকশিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধারায় বলা হয়েছে, যা বিভিন্ন দিক থেকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- ➢ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর অধ্যায়-২, ধারা-৩ এ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের নিয়োগ ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি কথা, ধারা-৫ এ

নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র, ধারা-২০ এ ছাঁটাই-এর কথা বলা থাকলেও কেরানীগঞ্জভিত্তিক এ সকল কারখানার এরকম কোনো ধরনের নিয়ম মানা হয় না।

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-৩৪ এ বলা হয়েছে কোনো পোশাক বা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না বা কাজ করতে দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে কেরানীগঞ্জ ভিত্তিক কারখানার ওপর গবেষণায় শ্রমিকদের যে বয়সে শ্রেণি করা হয়েছে সেখানে (১০-২০) বছর বয়সের শ্রমিকদের সংখ্যা ৩৮%। যাতে বোঝা যায় শ্রম আইনের কথা সে সকল প্রতিষ্ঠানে মানা হয়নি।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা-১০৮ এ কোনো প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কোনো প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সপ্তাহে উক্তরূপ কোনো শ্রমিকের মোট কর্মসময় ষাট ঘণ্টার অধিক হবে না এবং কোনো বৎসরে উহা গড়ে প্রতি সপ্তাহে ছাপ্পান্ন ঘণ্টার অধিক হবে না। কিন্তু এই গবেষণায় দেখা যায় শ্রমিকদেরকে দৈনিক গড়ে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, যা সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, যা শ্রম আইন পরিপন্থী।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬ এর ৯৪ নং ধারায় শিশু-কিশোর বলা আছে চল্লিশ বা ততোধিক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাদের ছয় বৎসরের কম বয়সী শিশুসন্তানদের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পক্ষান্তরে এ গবেষণায় যদিও কারখানার ৪০ এর বেশি মহিলা শ্রমিক নাই, তথাপিও এখানকার কারখানাগুলো ৩০ থেকে ৪০টি কারখানা এসাথে অবস্থিত যেখানে অনেক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তাই বলা যায় সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার মালিকদের মিলে শিশু কক্ষ ব্যবস্থা করা যৌক্তিক।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এ শ্রমিকদের শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি লিখিত দলিল, কিন্তু এ গবেষণায় দেখা যায় যে ৪২% শ্রমিকের শ্রম আইন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

বাংলদেশ সংবিধানঃ

বাংলাদেশ সংবিধানে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪ নং ধারায় শ্রমিক শোষণ হতে মুক্তির কথা বলা আছে। এছাড়া ৩৪ নং অনুচ্ছেদ জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণের কথা বলা আছে ও ৪০ নং ধারায় পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতার কথা বলা রয়েছে। কিন্তু এ সকল কোনো বিষয় কেরানীগঞ্জ এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিন্স কারখানায় শ্রমিকদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রয়োগ হচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO):

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর ৮৭, ৯৮ ও ১৮৭ নং কনভেনশনে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেরানীগঞ্জভিত্তিক এ সকল কারখানায় ILO কনভেনশন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার বর্তমান অবস্থা ও করণীয়*

–রত্না বেগম

ভূমিকা

মাতৃত্বলাভ নারীর স্বাভাবিক জীবনযাপনেরই একটি অংশ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বও বটে। একজন নারীর জীবনে মা হওয়ার চেয়ে গৌবর, আত্মতৃপ্তি বোধ হয় আর কিছুতেই নেই। এটি মহান আল্লাহ পাকের দেওয়া এক অসীম আশীর্বাদ এবং সম্মান।

বর্তমানে নারীরা শুধু গৃহবধূ নন। আজ তারা গৃহের বাইরেও বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী ও সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। যদিও তা মোট (৪৯.৫ মিলিয়ন) শ্রমশক্তির তুলনায় সামান্য পরিমাণ (১২.১ মিলিয়ন), কিন্তু সর্বোপরি তা দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথাপি নারীর কর্মক্ষেত্র আজও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাকে কাজ করতে হয় নানা ধরনের প্রতিকূলতার মাঝে। সহকর্মীদের অসহযোগিতা, অফিস কর্তৃপক্ষের আচরণ, রাস্তাঘাট, সর্বক্ষেত্রে নারী একটি বিরল অবস্থায় টিকে থেকে যুদ্ধ করে। তার ওপর সব নারীরই একটি অন্যতম দুশ্চিন্তা হলো মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে। কেননা মাতৃত্ব এমন একটি নাজুক সময় যে, এই সময়ে একটু অনিয়ম মা ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। তাই মাকে অন্যান্য সময়ের তুলনায় একটি বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দিতে বলা হয়। যদিও মায়েদের আমরা বলি যতটা সম্ভব সচেতন থাকতে, কিন্তু গর্ভকালীন কিছু উপদেশের মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন ১-২ ঘণ্টা বিশ্রাম গর্ভবতী প্রত্যেকটি মায়েদের অবশ্যই মেনে চলা উচিত। যা চাকরিরত মায়েদের অনেক সময় মেনে চলা সম্ভব হয় না। ফলে অনেকেই চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। যা আমাদের পরিবার ও সমাজ জীবন উভয়ের জন্যই চরম ক্ষতির। তাই দেশের শ্রমশক্তি নারীর অবদান এবং নারীর বিকাশ বৃদ্ধি, দক্ষ জনবল ধরে রাখা, সুস্থ ভবিষৎ প্রজন্ম এবং সর্বোপরি সমতা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে নারীর জন্য মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কাজ। একটি সুস্থ মানবজাতি গঠনে নারীকে জীবনের এই বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সহায়তা দেওয়া যে কোনো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেননা একজন সুস্থ মা মানে একজন সুস্থ সন্তান, একজন সুস্থ সন্তান মানে একটি সুস্থ জাতি আর একটি সুস্থ জাতি মানে একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ।

এক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োজনে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো আইএলও কর্তৃক সনদ গ্রহণ। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা-১৯৪৮, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডিও)।

---

* এই গবেষণাটি পরিচালনার সময় সরকারি চাকরিজীবীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস ছিল, পরবর্তীতে ৬ মাস করা হয়।

আর বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার বিধিবিধান হিসেবে সরকারী চাকরি বিধি, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব চাকরি বিধি রয়েছে।

এছাড়া বর্তমান সরকার খুব সম্প্রতি মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাস করার ঘোষণা দিয়েছে। এটা অবশ্যই একটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু বেশির ভাগ নারী যারা শ্রম আইনের আওতায় থাকা সত্ত্বেও মালিকের অনাগ্রহ অবহেলার কারণে মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনই একটি খাত হলো বাংলাদেশের বেসরকারী হাসপাতাল। এই হাসপাতালসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি হাসপাতালে সরকারি নিয়মনীতি অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে দেখা গেছে। কোনো হাসপাতালে মাতৃত্বকালীন ছুটি বেতনসহ ৪৫ দিন (সেন্ট্রাল হাসপাতাল), কোনো হাসপাতালে বেতনসহ ২ মাস (শমরিতা হাসপাতাল), কোনো হাসপাতালে বেতন ছাড়া এক মাস (কমফোর্ট হাসপাতাল), কোনো হাসপাতালে বেতনসহ ৪ মাস, (পপুলার স্পেশালাইজড হাসপাতাল), কোনো হাসপাতালে ৪ মাস বেতনসহ (ইবনে সিনা হাসপাতাল) দিতে দেখা গেছে।

এছাড়া হাসপাতালগুলোতে গর্ভাবস্থায় বাড়তি সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। উচ্চ শ্রেণি (১ম ও ২য় শ্রেণি কর্মচারী)গুলোতে কর্মরত মহিলারা হয়ত একটু সুযোগ-সবিধা পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু যারা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে কর্মরত রয়েছেন, তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনকভাবে শোচনীয়। তারা প্রতিষ্ঠান থেকে যেমন কোনো বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না তেমনি কম বেতনের কারণে নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে সকল সেবা ক্রয় করতে পারছেন না। তবু তারা নিরুপায় হয়ে শত প্রতিকূলতার মাঝেও মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন জীবন ও জীবিকার তাগিদে। এর ফল হিসেবে মা ও শিশুমৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু মাতৃত্বজনিত সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নারীর যেমন মৌলিক মানবাধিকার, তেমনি এটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের একটা অবশ্য প্রতিপালনযোগ্য দায়িত্ব। যার লংঘন শুধু নারীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না পক্ষান্তরে কর্মরত প্রতিষ্ঠান সমাজ ও রাষ্ট্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই বলা যায় যে, বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়েজন রয়েছে। কেননা সমাজের একটি অংশের নারীরা বঞ্চিত হলে তা পুরো সমাজকে প্রভাবিত করে।

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ধারণা এবং মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা আইনসমূহ

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার ধারণা

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা মূলত এমন কিছু কর্মসূচ, ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি যা নারীদেরকে তাদের গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনসংক্রান্ত ভূমিকা পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রদান করা হয়। এক কথায় বলে দেওয়া যায় বাংলাদেশে কোনো নারী শ্রমিক-কর্মচারীই পূর্ণাঙ্গ মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ভোগ করে না। তা তিনি সরকারি বা বেসরকারি যে সেক্টরেই কাজ করুন না কেন। কেননা পূর্ণাঙ্গ মাতৃত্বকালীন

সুবিধা বলতে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা আইএলও, নারীর জন্য জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল সিডো (CEDAW) সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যা বোঝায় তা হলো :

- গর্ভবতী অবস্থায় চাকরিচ্যুতি এবং নির্যাতন থেকে সুরক্ষা পাওয়া
- চাকরি হারানোর ভয় ছাড়াই মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোট করতে পারা
- মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটানোর সময় বেতন বা মজুরি সুনিশ্চিত থাকা
- কাজে যোগদানের পরেও একটিা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারা
- বাচ্চা হওয়ার আগে ও পরে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসুবিধা পাওয়া এবং
- ছয় বছরের কমবয়সী বাচ্চার জন্য কর্মক্ষেত্রে যে কেয়ার সেন্টারের সুবিধা পাওয়া ইত্যাদি বোঝায়।

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা আইন (আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ আইএলও সনদ)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও কনভেনশন এ পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে তিনটি সনদ গ্রহণ করছে। এগুলো হলো :

- ❖ মাতৃত্ব সুরক্ষা সনদ ১৯১৯ (সনদ নং-০৩)
- ❖ মাতৃত্ব সুরক্ষা সনদ (সংশোধিত) ১৯৫২ (সনদ নং-১০৩)
- ❖ মাতৃত্ব সুরক্ষা সনদ ২০০০ (সনদ নং-১৮৩)

  [বাংলাদেশ একটি সনদও স্বাক্ষর করেনি]

- ❖ এছাড়া আইএলও কনভেনশন-১৫৬ এর আওতায় সন্তান জন্মের সময় বা পরে পুরুষ কর্মচারীর পিতৃত্ব ছুটির আবেদন করতে পারবেন। অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ইসরাইল, জাপান, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে পিতৃত্ব ছুটির বিধান রয়েছে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা-১৯৪৮

- ❖ প্রত্যেকেরই নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য অথবা অনিবার্যকারণে জীবনযাপনের অপারগতার কারণে নিরাপত্তা লাভ এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। (অনুচ্ছেদ-২৫(১))
- ❖ মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে অথবা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে যেভাবেই ভূমিষ্ঠ হোক না কেন, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে (অনচ্ছেদ-২৫-(২))

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি-১৯৯৬

- ❖ শিশুর জন্মের পূর্বে ও পরে একটা যুক্তিসংগত সময়ের জন্য মায়েদেরকে বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এ সময় কর্মজীবী মায়েদেরকে বেতনসহ ছুটি অথবা পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা-সুবিধাসহ ছুটি প্রদান করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-১০(২))

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) ১৯৭৯

- ❖ বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ এবং তাদের ফলপ্রসূ কাজ করার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক) গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্বজনিত ছুটি এবং বৈবাহিক কারণে নারীকে চাকরি থেকে বরখাস্তের ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করতে হবে।

খ) পূর্বের চাকরি, জ্যেষ্ঠতা অথবা সামাজিক ভাতাদি হারানো ব্যতিরেকে বেতন অথবা সামাজিক সুবিধাসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রবর্তন করতে হবে । (অনুচ্ছেদ-১১ (২)

- ❖ এছাড়া Meternity Benefit Act-1961 এবং Employes state Insurance Act-1948 এর আওতায় কর্মীকে বেতনসহ ছুটি, চিকিৎসা ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। শ্রীলংকায় সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছাড়াও সন্তানের ৬ মাস হওয়া পর্যন্ত কাজের ফাঁকে Nursing Break দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার আইন

- ❖ সরকারি চাকরি বিধি
- ❖ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬
- ❖ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকরিবিধি

সরকারি চাকরিবিধি

- ❖ চার মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি
- ❖ চাকরিজীবনে দুইবার বেতনসহ ছুটি
- ❖ মাতৃত্বকালীন ছুটি 'ছুটি হিসাব' হবে, বিয়োগ হবে না।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা

- ❖ সবেতনে ১৬ সপ্তাহ ছুটি (সন্তান প্রসবের আগে ৮ সপ্তাহ ও পরে ৮ সপ্তাহ) (ধারা-৪৬)
- ❖ প্রসূতিকল্যাণ ভাতা সম্পূর্ণ নগদে প্রদান (ধারা-৪৮)
- ❖ কর্মচ্যুত না হওয়া (ধারা-৫০)
- ❖ গর্ভাবস্থায় ভারী কিছু বহন ও দাঁড়িয়ে কাজ না করা (ধারা-৪৫(৩))
- ❖ অনধিক ৬ বছরের শিশুর জন্য ডে-কেয়ার (ধারা-৯৪)

সুবিধা ভোগের শর্ত

- ❖ একই মালিকের অধীনে ৬ মাসের অবিচ্ছিন্ন কাজ
- ❖ ডে-কেয়ার সেন্টারের জন্য কারখানার ৪০ বা ৪০-এর অধিক নারীশ্রমিক কর্মরত থাকতে হবে।

আইন যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেনি

- ❖ গর্ভকালীন চিকিৎসা সুবিধা
- ❖ গর্ভকালীন জটিলতা
- ❖ কর্মস্থলে মাতৃত্বজনিত কারণে উদ্ভূত বৈষম্য
- ❖ বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য বিরতি

গবেষণার যৌক্তিকতা

কর্মস্থলে নারীর শত সমস্যার মধ্যে একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষাজনিত সমস্যা। এই সমস্যার কারণে মায়েদের বিভিন্নরকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন সময়ের আগে প্রসব, অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতা, কম ওজনের শিশু জন্ম, গর্ভপাত, বিকলাঙ্গ শিশু, প্রসবপূর্ব শিশুমৃত্যু স্নায়ুবিক অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি বছর আমাদের দেশে গর্ভজনিত কারণে ১২,০০০ থেকে ১৫,০০ (নিপসম রিপোর্ট) নারী মৃত্যুবরণ করেন এবং অনেকে এই কারণে চাকুরি ছাড়তে বাধ্য হন। এটি আমাদের পরিবার ও সমাজ উভয়র জন্যই ক্ষতি। তাই প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নারীর মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। আর এই প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিস্বরূপ ইতোপূর্বে বেসরকারি ক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হয়েছে। যেমন- চাতাল শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, গৃহ-শ্রমিক এবং নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা হয়েছে। এমনই বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা খাতে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়েও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিয়ে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা হয়নি। তাই সেখানে কর্মজীবী নারীর মাতৃত্বকালীন অবস্থা কিরূপ, এসংক্রান্ত আইন প্রয়োগের বিরাজমান অবস্থা এবং সংশিষ্ট আইনের দুর্বল দিকগুলো বিশ্লেষণ করা। মাতৃত্বকালীন আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার কী ভূমিকা হওয়া উচিত তার পুনরালোচনা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নারীর মাতৃত্বকালীন অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর সুযোগ, উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে নিরীক্ষা করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সাধারণ উদ্দেশ্য

বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় বের করা মূলত আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

বেসরকারি হাসপাতালে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা সম্পর্কে জানা

- বর্তমানে তারা কী ধরনের সুবিধা পাচ্ছে সে সম্পর্কে জানা।
- প্রাপ্ত মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা তাদের জন্য পযাপ্ত কি না?
- তারা কী ধরনের কাজ করেন?
- তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে যতটুকু সচেতন সে সম্পর্কে জানা।

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

গবেষণায় ব্যবহৃত মূল পদ্ধতিগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

গবেষণা নকশা নির্ধারণ : প্রথমেই গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি গবেষণা নকশা তৈরি করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় উপাত্ত নির্দিষ্টকরণ : দুটি বিষয়ের ওপর উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে।
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারী
হাসপাতালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

- **প্রাথমিক পর্যায়ের উপাত্ত :** প্রাথমিক পর্যায়ের উপাত্তের জন্য দুইভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত এবং দ্বিতীয়ত চেকলিস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে key person-দের সাথে আলোচনা করে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় । সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্তকে পরবর্তীতে বিভিন্ন সারণি আকারের এবং গুণগত উপাত্তকে রিপোর্টে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- **দ্বিতীয় পর্যায়ে উপাত্ত :** বিভিন্ন গবেষণার রিপোর্ট, B.S.S রিপোর্ট, প্রেসক্লিপিং, বিল্‌স থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের লিফলেট, ব্রুশিওর ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **গবেষণার এলাকা :** ঢাকা শহরের ধানমন্ডি এলাকার বেসরকারি হাসপাতাল গুলো এর আওতাভুক্ত।
- **সামগ্রিক ও বিশ্লেষণের একক :** বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী এই গবেষণার সামগ্রিক এবং ৪০ জন কর্মচারীকে গবেষণা বিশ্লেষণের একক ধরা হয়েছে।
- **নমুনা নির্বাচন :** আলোচ্য গবেষণায় কিছুসংখ্যক সুবিধার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নমুণায়ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করে কেসস্টাডি করা হয়েছে। ধানমন্ডি এলাকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৪০ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারীদেরকে নমুনা হিসেবে বেছে নিয়ে কেসস্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।
- **উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি :** গবেষণার উদ্দেশ্যকে মনে রেখে কেস স্টাডিজ পদ্ধতির উৎস তথা এককের সাথে অলোচনা করে এককের বক্তব্য শুনে এবং এককের অবস্থা

পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে ঘটনা অনুধ্যান সহায়তার জন্য একটি সাক্ষাৎকার অনুসূচি তৈরি করা হয়েছে। গবেষণা দলের সদস্যরা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আগে থেকে গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটি অনুসূচি তৈরি করা হয়েছিল এবং যে অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

❖ **উপাত্ত সংগ্রহকারী :** চারজন করে একটি মাঠ জরিপ টিম গঠন করা হয়। এই টিমের জন্য একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। সুপারভাইজার মাঠ জরিপকারীদের তদারকি ও প্রশ্নপত্রের ভুল সংশোধন করেছেন। জরিপ কাজে মোট ১০ দিন সময় লেগেছে। প্রশ্নপত্র পূরণ ও প্রধান উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার এই দুটি বিষয় তাদেরকে করতে হবে।

❖ **উপাত্ত সংগ্রহ :** সংখ্যাগত উপাত্তের জন্য প্রথমে খসড়া প্রশ্নমালা তৈরি করে পরবর্তীতে তা মাঠ পরীক্ষণ করা হয় এবং ভুলভ্রান্তে ঠিক করে পরবর্তীতে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে Close ended এবং Open ened উভয় ধরণের প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। উপরন্তু প্রশমালা তৈরিতে বিভিন্ন জরিপ, রিপোর্ট বই, সাময়িকী ও বিল্‌স-এর কর্মকর্তাদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

❖ **প্রশ্নমালা পূর্ব পরীক্ষণ :** সর্বমোট ২৩টি প্রশ্ন করা হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্নের সাব গ্রুপ ছিল এবং বিল্‌স এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়।

❖ **উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ :** কিছু উন্মুক্ত প্রশ্নকে নির্বাচন করা হয় এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করে উপাত্তগুলো প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

❖ **উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখা :** প্রশ্নমালার উপাত্ত প্রক্রিয়ার পর টেবুলার আকারে নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় টেবিল তৈরি করা হয়।

❖ **গুরুত্বপূর্ণ উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার :** কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অধিকতর জানেন কিংবা অধিকতর অভিজ্ঞতা রয়েছে, এরকম উত্তরদাতাদের বিশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে উত্তরদাতার ঐ নির্দিষ্ট বিষয় কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা এবং মতামতগুলো তুলে ধরা হয়।

❖ প্রধানত হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

❖ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সাধারণত যে কোনো গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের উপায় বা কৌশল। মূলত তথ্য সংগ্রহের কৌশলের ওপরই নির্ভর করে তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা। তথ্য সংগ্রহের উৎসের প্রেক্ষিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল ব্যবহার করা হয় । এখানে উল্লেখ্য যে 'বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা বর্তমান অবস্থা ও করণীয়' শীর্ষক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে অনেক সুবিধা যেমন উত্তরদাতার অধিক হারে উত্তর লাভ, অমৌখিক আচরণ, প্রত্যক্ষণ, পরিবেশ,

গতিনিয়ন্ত্রণ প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ততা সাক্ষাৎদাতার নিজেই উত্তরদান ব্যাপক প্রয়োগযোগ্যতা ইত্যাদি থাকলে তথ্য সংগ্রহের সময় অন্যান্য পদ্ধতির মতো এই পদ্ধতিতেও বেশকিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

- গবেষণা এলাকাটি ঢাকা শহরে হওয়ায় রাস্তাঘাটে অতিরিক্ত যানজটের কারণে গবেষকদের নির্ধারিত হাসপাতালে পৌছাতে প্রত্যেক তথ্য সংগ্রহকারীকে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির স্বীকার হতে হয়। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন তৎপরতা এবং মাঠ পর্যায়ে উত্তরদাতাদের খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়।
- এই গবেষণার পদ্ধতি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি হওয়ায় উত্তরদতারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে উত্তর প্রদানের সুযোগ পান না। তাই অনেক সময় অসমঝোতাপূর্ণ উত্তর প্রদান করতে দেখা যায়।
- উত্তরদাতাকে তার দৈনন্দিন কাজের সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হয় বলে এক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।
- উত্তরদাতা অনেক সময় নিজের নাম ও পরিচয় এবং সংবেদনশীল প্রশ্নের উত্তর গোপন করতে ইচ্ছুক থাকেন। কিন্তু সাক্ষাৎকারে উত্তরদাতা তেমন কোনো সুযোগ পান না। ফলে তার কাছ থেকে অনেক তথ্য সঠিকভাবে বের করে আনা কঠিন হয়ে পড়ে।
- অস্থায়ী কর্মচারী মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা পাওয়ার জন্য অবশ্যই প্রত্যেকটি কর্মীকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৬ মাস স্থায়ীভাবে কাজ করতে হবে। কিন্তু দেখা গেছে যে প্রত্যেকটি হাসপাতালে কর্মরত নারী কর্মচারীকে কোনো ভাবেই অস্থায়ী হওয়ার কারণে নমুনা খুঁজে পেতে বেশ হয়রানির শিকার হতে হয়।
- হাসপাতালে কর্মরত নারী কর্মচারীর ৫০% এর শিক্ষাগত যোগ্যতা ০-৫ শ্রেণি পর্যন্ত (সারণি-২) হওয়ার কারণে অনেকেই না বুঝে, ভয়ে সঠিক উত্তর গোপন করেন।
- গবেষণাটি যাতে তথ্যবহুল হয় সেজন্য বেশ কয়েকটি হাসপাতাল নির্বাচন করা হলেও কয়েকটি হাসপাতালে (ল্যাবএইড, ইবনে সিনা ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল হাসাপাতাল) কর্মরত কর্তাব্যক্তিদের অসহযোগিতার কারণে সাক্ষাৎকারপর্ব অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি।
- গবেষণাটিতে ৪০ জনের নমুনা নেওয়া হয়। কিন্তু গবেষণা এলাকার কয়েকটি হাসাপাতাল কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে ৪০ জন নমুনা খুঁজে বের করতে ভীষণ হয়রানির শিকার হতে হয়।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার বর্তমান অবস্থা ও করণীয় : প্রাথমিক উপাত্তের বিশ্লেষণ

উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত তথ্য

সারণি -১ : বেসরকারি হাসপাতলে নিয়োজিত ৩য় ও ৪থর্ত শ্রেণির কর্মচারীর বয়স

কর্মীর বয়স (বৎসর)	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
২০-২৪	৫	১২.৫০
২৫-২৯	১৬	৪০.০০
৩০-৩৪	১১	২৭.৫০
৩৫- এর উর্ধ্বে	৮	২০.০০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

সারণি-২ : বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা।

কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
০-৫ম শ্রেণি	২০	৫০.০০
৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি	১১	২৭.৫০
এসএসসি	৭	১৭.৫০
এইচএসসি	২	০৫.০০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

সারণি-৩ : বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর পরিবারের সদস্যসংখ্যা

পরিবারের সদস্যসংখ্যা (জন)	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
১-৩	১৭	৪২.৫০
৪-৬	২১	৫২.৫
৭-৯	২	৫
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

সারণি-৪ : বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তান সংখ্যা

কর্মীদের পরিবারের সন্তানসংখ্যা (জন)	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
১	১৭	৪২.৫০
২	১২	৩০.০০
৩	৬	১৫.০০
৪-এর ঊর্ধ্বে	৫	১২.৫০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

উত্তরদাতাদের কর্ম ও কর্মে যোগদান-সম্পর্কিত তথ্য:

সারণি-৫: বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর পদবি

কর্মীর পদবি	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
আয়া	৩১	৭৭.৫০
ক্লিনার	৩	৭.৫০
নার্স	৬	১৫.০০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

সারণি-৬ : বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারির চাকরির বয়সঃ

কর্মীর চাকরির বয়স (বছর)	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
০-৫	১৪	৩৫.০০
৬-১০	১৮	৪৫.০০
১১-১৫	৭	১৭.৫০
১৬-২০	১	২.৫০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

সারণি-৭ : বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর কাজের ধরন

কর্মীদের কাজের ধরন	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
ঔষুধ সরবারহ	২	৫.০০
রোগীর সেবা	১৪	৩৫.০০
ওয়ার্ডের কাজ	২	৫.০০
ধোয়া-মোছা	১৭	৪২.৫০
সব ধরনের কাজ	৫	১২.৫০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

কাজের ধরন

সারণি-৮ : বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর নিয়োগপত্রের মাধ্যমে নিয়োগদান

নিয়োগ পত্রের মাধ্যমে নিয়োগদান	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩৬	৯০.০০
না	৪	১০.০০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

নিয়োগপত্রের মাধ্যমে নিয়োগদান :

কর্মে নিয়োগদানের সময় প্রত্যেক কর্মীর নিয়োগপত্র পাওয়ার অধিকার রয়েছে। হাসপাতালগুলোতেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সাক্ষাৎকারপর্বে অংশগ্রহণকারী শতকরা ৯০ জন কর্মে যোগদানের সময় নিয়োগপত্র পেয়েছে বলে জানা যায়। বাকি ১০% না পাওয়ার পেছনে বড় একটি কারণ হয়েছে কর্মীদের অস্থায়ীত্বতা।

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা-সম্পর্কিত তথ্য

সারণি-৯ বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মে যোগদানের পর সন্তান গ্রহণের সংখ্যা

কর্মে যোগদান করার পর সন্তান সংখ্যা	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
১	৩১	৭৭.৫
২	৭	১৭.৫
৩	২	৫
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস: গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত

কর্মে যোগদান করার পর সন্তানসংখ্যা

সারণি-১০ বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি

মাতৃত্বকালীন ছুটি (মাস)	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
১-২	২২	৫৫
৩-৪	১৮	৪৫
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত

মাতৃত্বকালীন ছুটি

গবেষণা এলাকায় বিদ্যমান বেসরকারী হাসপাতালগুলোতে মাতৃত্বকালীন ছুটি কম হোক আর বেশি হোক দেওয়া হয়। সারণি-৯ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৪০ জন কর্মচারীর মধ্যে ৫৫% (২২ জন) কর্মী মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছেন প্রায় ১-২ মাস আর বাকি ৪৫% (১৮ জন) কর্মী পেয়েছেন প্রায় ৩-৪ মাস। অর্থাৎ তারা গড়ে ২.৪ মাস করে ছুটি পেয়েছেন। তবে উল্লেখ্য এই যে গবেষণা এলাকাতে এমন একটি বেসরকারি হাসপাতাল পাওয়া যায় যেখানে মাতৃত্বকালীন ছুটির কোনো বিধান নেই। কেউ খুব অসুবিধায় পড়লে তাকে মাত্র এক মাসের বেতন ছাড়া ছুটি দেওয়া হয়।

Key Person
আয়েশা খাতুন, মেট্রন
কমফোর্ট হাসপাতাল (ঢাকা)

গবেষণা এলাকাতে অবস্থিত ১ টি বেসরকারি হাসপাতাল কমফোর্ট হাসপাতালের মেট্রন, মো: আয়েশা খাতুন-এর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, কমফোর্ট হাসপাতালে মাতৃত্বকালীন কোন ছুটি দেওয়া হয় না। তবে কেউ খুব অসুবিধায় পড়লে তাকে বেতন ছাড়া একমাস ছুটি দেওয়া হয়।

সারণি-১১ বেসরকারী হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মাতৃত্বকালীন ছুটি বেতনসহ কি না

বেতন	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
না	৩	৭.৫
পূর্ণ বেতনসহ	৩২	৮০.০
আংশিক	৫	১২.৫
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

মাতৃত্বকালীন ছুটি বেতনসহ কি না সে-সম্পর্কিত তথ্য

সাক্ষাৎকারপর্বে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৩২ ভাগ (৮০%) কর্মীই পূর্ণ বেতনসহ ছুটি পেয়েছেন। ৫ জন (১২.৫%) কর্মী পেয়েছেন আংশিক বেতনসহ ছুটি এবং ৩ জনকে পাওয়া যায় কোনো বেতন পাননি। তবে যে ৩২ জন কর্মী বলেছেন যে তারা পূর্ণ বেতনসহ ছুটি পেয়েছেন, তারা সত্যিই কি পূর্ণ বেতনসহ ছুটি পেয়েছেন, তারা সত্যিই কি পূর্ণ বেতনসহ ছুটি পেয়েছিলেন? না মিথ্যার আশ্রয় নিলেন, এটা যাচাইযোগ্য বিষয়।

বেতনসহ ছুটি ছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

সারণি-১২ বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছুটি ছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

বেতন	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭	৪২.৫০
না	২৩	৫৭.৫০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

গবেষণা এলাকার প্রতিটি হাসপাতাল লক্ষ করলে দেখা যায় যে হাসপাতালগুলোতে মাতৃত্বকালীন ছুটি বেতনসহ ছাড়া এই সময়ে অন্যান্য ভাতা বা কল্যাণ ফান্ড থেকে কোন সাহায্যের ব্যবস্থা নেই। তবে কর্মরত হাসপাতাল থেকে সেবা নিলে তাদের ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। গবেষণা এলাকাতে একটি হাসপাতাল (সেন্ট্রাল হাসাপাতাল) পাওয়া যায় যেখানে কর্মীরা খুব সমস্যায় পড়লে তাকে লোন-সুবিধা দেওয়া হয়। সারণি-১১ থেকে দেখা যায় যে, ৪০ জন কর্মী খুব সমস্যায় পড়লে তাকে লোন-সুবিধা দেওয়া হয়। সারণি-১১ থেকে দেখা যায় যে, ৪০ জন কর্মীর মধ্যে ১৭ জন (৪২.৫০%) অন্যান্য সুবিধা পেয়েছেন এবং বাকী ২৩ জন (৫৭.৫০%) অন্যান্য সুবিধা পেয়েছেন এবং বাকি ২৩ জন (৫৭.৫০%) কোনো সুবিধা পাননি।

Key Person

ড. এম. এ লতিফ

সহকারী পরিচালক

সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেড

তিনি বলেন যে, এই হাসপাতালে বেতনসহ মাত্র ৪৫ দিন ছুটি দেওয়া হয়। তবে কেউ এর থেকে বেশি ছুটি নিতে চাইলে বেতন ছাড়া ছুটি কাটাতে হয়। এখানে ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়, তবে সকলের জন্য এটি নয়। ব্যক্তিবিশেষে এই ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ধরন

সারণি-১৩ বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছুটি ছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

সুবিধার ধরন	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস	২৫	৬২.৫০
১০%-৭৫%	১৫	৩৭.৫০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য মতে জানা যায়, হাসপাতালগুলোতে অন্যান্য সুবিধা বলতে ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস এবং ডিসকাউন্ট সুবিধাকে বোঝায়। তবে সকলেই সম্পূর্ণ ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস পান না। এটি ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে।

সারণি-১৪ বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মীদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ

ক্ষতিকর কাজ করতে হয়েছে কি না	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৯	২২.৫
না	৩১	৭৭.৫
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত

গর্ভকালীন সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ

গবেষণা এলাকার হাসপাতালগুলোর কয়েকটিতে (সেন্ট্রাল হাসপাতাল, কমফোর্ট হাসপাতাল ইত্যাদি) ৪ মাস বেতনসহ ছুটি দিতে না দেখা গেলেও কর্মীদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হয়, এমনটি কমই ছিল। তবে অনেকে অসাবধানতার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। সারণি-১৩ থেকে দেখা যায় যে, ৩১ জন (৭৭.৫%) কর্মীকেই কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়নি।

সারণি-১৫ বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মীদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ধরন

ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ধরন	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
রোগী ওঠানো / নামানো	৩	৩৩.৩
আই সি ভি	১	১১.১
অন্যান্য	৫	৫৫.৬
মোট	৯ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত

গর্ভকালীল সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ধরণ

উত্তরদাতাদের মধ্যে যে ৯ জন (সারণি-১৩) ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৩ জন (৩৩.৩) কর্মী রোগী ওঠানো-নামানোর কাজ, ১ জন (১১.১) কর্মী আইসিইউতে এবং ৫ জন (৫৫.৫) কর্মী অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

উত্তরদাতারা কেউই মাতৃত্বকালীণ ছুটির পর কাজে যোগদান করে বাচ্চাকে সাথে রাখতে পারত কি না, সে সংক্রান্ত তথ্য: মাতৃত্বকালীন ছুটির পর কাজে যোগদান করে কোনো কর্মী বাচ্চাকে সাথে রাখতে পারেননি।

উত্তরদাতার শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা আছে কি না সে সংক্রান্ত তথ্য : কোনো প্রতিষ্ঠানে দিবাযত্ন কেন্দ্র না থাকায় তারা শিশুদের বাসায় রেখে আসতেন।

মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা সম্পর্কে কর্মীর অবগতি

সারণি-১৬ বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা সম্পর্কে কর্মীর অবগতি

ছুটি সম্পর্কে জানেন কি না	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৪	৬০
না	১৬	৪০
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

সারণি-১৭ বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা সম্পর্কে জানার মাধ্যম

মাধ্যম	গণসংখ্যা	শতকরা হার
অফিস কর্তৃক	৮	৩৩.৩৩
গণমাধ্যম	৩	১২.৫০
অন্যান্য	১১	৪৫.৮৩
সমিতি	২	৮.৩৩
মোট	২৪ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

কিভাবে জানেন

উত্তরদাতা ৬০% কর্মী (সারণি-১৫) মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা সম্পর্কে জানেন বলে জানান তাদের মধ্যে ৩৩.৩৩% (৮ জন) অফিস থেকে জানতে পারেন, ১২.৫% (৩ জন) গণমাধ্যম থেকে, ৪৫.৮৩% (১১ জন) অন্যান্য মাধ্যম এবং ৮.৩৩% (২ জন) বিভিন্ন সমিতি থেকে এই সময়মীমা সম্পর্কে জানতে পারেন।

উত্তরদাতার মতে, কোনো সহকর্মী মাতৃত্বকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য:

তাদের জানা মতে, কোনো সহকর্মী মাতৃত্বকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন সুবিধার ব্যবস্থা ছিল না তখন কেউ সুবিধা পায়নি। তবে যখন থেকে সুবিধা দেওয়া হয়, তখন থেকে কেউ বঞ্চিত হননি। তারা ছুটি পেয়েছেন পূর্ণ হোক আর আংশিক।

বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

সারণি-১৮

ব্যবস্থা	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
ছুটি বাড়ালে ভালো হতো	১৩	৩২.৫০
অন্যান্য ভাতা	৬	১৫
বেতন বেশি হলে ভালো হতো	৯	২২.৫
বাচ্চাদের রাখার ব্যবস্থা হলে ভালো হতো	২০	৫০
কিছুই বলেনি	৮	২০
ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা (সম্পূর্ণ)	৫	১২.৫
৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে	২	৫
ছুটি বেতনসহ হলে ভালো হতো	২	৫
অন্যান্য সুবিধা	৫	১২.৫
নাইট ডিউটি না থাকলে ভালো হতো	৫	১২.৫
মোট	৭৫ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত

বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের অধিকার ও কল্যাণে নিয়োজিত ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবগতি

সারণি- ১৯

জানেন কি না	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬	১৫
না	৩৪	৮৫
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

নারীদের অধিকার ও কল্যাণের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে সম্পর্কে জানেন কিনা সে সম্পর্কিত তথ্য

সারণি- ২০

নারীদের অধিকার ও কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার মাধ্যম

অবগতি	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
জানি না	১	১৬.৬৬
মনে নাই	৪	৬৬.৬৬
অন্যান্যভাবে	১	১৬.৬৬
মোট	৬ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত

উত্তরদাতাদের মধ্যে যে ৬ জন (১৫%) কর্মী বলেছিলেন যে, তারা নারীদের অধিকার ও কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জানেন, তারা ধরতে গেলে কিছুই জানেন না (সারণি)

সারণি-২১ উত্তরদাতারা প্রতিবছর যে নারী দিবস পালিত হয়, সে সম্পর্কে জানে কি না, সে সম্পর্কিত তথ্য

জানেন কি না	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৫	৩৭.৫
না	২৫	৬২.৫
মোট	৪০ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত

দেখা গেছে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৬২.৫% জন কর্মী 'নারী দিবস' সম্পর্কে কিছু জানেন না। আর বাকি ৩৭.৫% কর্মী যা জানেন তা প্রকৃত অর্থে খুব সামান্য।

সারণি-২২

কী জানেন	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলে	৭	৪৬.৬
জানে না	৮	৫৩.৩৩
মোট	১৫ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

কিভাবে জেনেছেন

সারণি-২৩ উত্তরদাতা কর্মীরা কিভাবে জেনেছেন

কিভাবে জানেন	কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার
নিজেই জেনেছি	১	৬.৬৬
সংস্থা	১	৬.৬৬
অন্যের কাছ থেকে	১	৬.৬৬
কোনো মন্তব্য নেই	১১	৭৩.৩৩
মোট	১৫ জন	১০০.০০

উৎস : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রণীত।

গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা

ফলাফল:

বাংলাদেশে মোট বেসরকারি হাসপাতাল ১০০৫টি। (Wikipediaproject.the freeencyclopedia, 2006) এর মধ্যে আমাদের নির্ধারিত গবেষণা এলাকায় অবস্থিত

বেসরকারি হাসপাতাল গুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই সব হাসপাতালে বর্তমানে নিয়োজিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের নিয়োগ পত্রের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয় (সারণি-৭)। ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান আছে (সারণি-২)। অনেক কর্মী আছেন যাদের চাকরির বয়স অনেক হলেও কর্মে যোগদানের পর ৩-এর অধিক কারো বাচ্চা হয়নি। (সারণি-৮)। তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন (সারণি-৭)। ঔষধ সরবরাহ থেকে শুরু করে রোগীর সেবাযত্ন, ধোয়া-মোছা, সবই করে না কিন্তু নিয়োগপত্রে একটি পোস্টে নিয়োগ দেওয়া হলেও তাদেরকে দিয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল ধরনের কাজ করানো হয়। মাতৃত্বকালীন সময়ে ও কাজের কোনো হেরফের করা হয় না। এমনকি অনেক সময় দুই শিফটে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো হয়। এজন্য কোনো অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করাও হয় না। তাদের অধিকাংশই মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা সম্পর্কে অবগত কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের করার কিছু নাই বলে জানান। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে ছুটি দেওয়া হয় তারা সেটিকেই আশীর্বাদ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে কথা বলে জানা গেল যে তারা চাকুরি যাওয়ার ভয়ে কোনো ঝামেলাপূর্ণ অবস্থায় যেতে রাজি না। অথচ তারা এটা জানেন না যে মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে পাওয়া তাদের একটি অন্যতম মানবাধিকার। হাসপাতালগুলোর কোনোটিতে ৪৫ দিন (সেন্ট্রাল হাসপাতাল), কোনোটিতে বিনা বেতনে এক মাস ছুটি দেওয়া হয়। কর্মরত প্রতিষ্ঠানে সেবা নিলে তাদের কাছ থেকে ফিস রাখা হলেও তা তাদের ন্যূনতম বেতনের কাছে আকাশছোঁয়া মনে হয়। মাতৃত্বকালীন সময়ে মায়েদের পুষ্টিকর খাবারের কথা বলা হলে তাদের পক্ষে এই ন্যূনতম বেতন (২২০০/-) দিয়ে তা মেনে চলা সম্ভব হয় না। ফলে মা ও বাচ্চা উভয়ই অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগেন। তবু তারা কাজ করেন জীবন ও জীবিকার তাগিদে। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে কর্মের থেকে কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি। এছাড়া আরও একটি বড় সমস্যার কথা জানা যায় তা হলো এসব হাসপাতালে কোনে ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা নেই। ফলে জন্মপ্রাপ্ত শিশুরা প্রত্যহ ৮-১০ ঘণ্টা বুকের দুধ থেকে বিরত হয়। যা শিশুর জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ হতে পারে। কেননা বলা হয়ে থাকে যে জন্মের পর অবশ্যই ৬ মাস শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। তাই উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বলা এটা বাহুল্য যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে কর্মরত নারী কর্মচারীরা যাতে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার যথাযথ ব্যবহার করতে পারে সেজন্য যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই জরুরি।

সুপারিশমালা

প্রসবের পর মা ও শিশু দুজনেরই যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে। অসুস্থতা অথবা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মাতৃমৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ মা মারা যাচ্ছেন প্রসবকালীন অথবা প্রসবের পর (সমকাল ০৭.০৩.২০১০)। আমাদের প্রচলিত আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুবিধার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালগুলোয় আজও সংকীর্ণতা রয়ে গেছে। এমনকি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার মাপকাঠিতে উপযুক্ত হলেও প্রার্থী বাছায়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের সুযোগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তাদের মন্তব্য হচ্ছে মেয়েদের নিয়োগ দিলেই তো দুদিন পর ম্যাটারনিটি লিভ শুরু হয়ে যাবে। যা কাজের পরিপন্থী হতে পারে। ফলে নারীশ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের প্রকৃত অধিকার থেকে।

এছাড়া নারীশ্রমিকরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পেছনে অন্য আর একটি বড় কারণ হচ্ছে তাদের কল্যাণে যে আইনগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতা। ফলে তারা দুদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিয়ে স্বল্প পরিসরে সম্পূর্ণ করা এ সমীক্ষা থেকে নিম্ন লিখিত সুপারিশমালাগুলো করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে নারী তথা কর্মজীবী নারীদের অধিকার অর্জনে ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

সুপারিশমালা গুলো হলো–

১. সরকারি ও বেসরকারি প্রত্যেকটি হাসপাতালে প্রচলিত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি পূর্ণ বেতনে দিতে হবে।

২. মাতৃত্বকালীন ছুটি ব্যাপ্তি বাড়িয়ে ১২০ দিন থেকে ১৮০ দিন করা যেতে পারে। আর তা না সম্ভব হলে বিকল্প পদ্ধতি হসেবে অবশ্যই কর্মরত প্রতিষ্ঠানে শিশুদের রাখার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার-এর ব্যবস্থা করতে হবে। মায়েদের প্রতি কঠোর না হয়ে একটু সহানুভূতিশীল হতে হবে যত দিন পর্যন্ত তার সন্তানের বয়স কমপক্ষে ৬ মাস পূর্ণ না হয়। কেননা এ সময় দুধ একটি শিশুর প্রধান খাদ্য।

৩. যে কোনো নারীকে কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বে তার নিয়োগপত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটির বিষয়টি একটি উপ-ধারা হিসেবে সংযোজন করা যেতে পারে।

৪. মাতৃত্বকালীন ছুটি যাতে প্রত্যেকটি মা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেন সেজন্য তাদের সুবিধামতো ছুটি ভোগ করার অধিকার দিতে হবে।

৫. মাতৃত্বকালীন অবস্থায় অধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ এ অধিকার-সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে অধিকাংশেরই কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই।

৬. উন্নত বিশ্ব যেমন– কানাডা, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড-এর মতো আমাদের দেশেও মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে মায়ের অনুপস্থিতিতে বাবা শিশুর দেখাশুনা করলে মায়ের সাহস ও মনোবল বেড়ে যাবে এবং কাজে মনোযোগ আসবে। এতে প্রতিষ্ঠান ও দেশ উভয়ই লাভবান হবেন।

৭. নারী শুধু নারী নয়। নারী মানুষ। ফলে নারীর এই সন্তান ধারণের সময়টুকুতে তার প্রতি সহযোগিতার হাত বড়াতে হবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের।

৮. নারী শুধু ভোগের বস্তু, নারী সংসারের দায়ভার বহন করবে, শিশু জন্ম দেবে এবং প্রতিপালন করবে, এটা শুধুই নারীর দায়িত্ব। এ ভাবনা সমাজ থেকে দূর করতে হবে।

৯. মাতৃত্বকালীন সময়ে মায়েদের অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার ও সেবাযত্নের প্রয়োজন হয়, যা তার নির্ধারিত বেতনে সংকুলান হয় না; তাই বিভিন্ন ফান্ড থেকে এই সময়

তার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা মূল বেতনের শতকরা ২৫-৩০ ভাগ অতিরিক্ত ভাতা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।

১০. জাতীয় পর্যায়ে তাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে এবং তাদের নিয়মিত মজুরি ও শ্রমঘণ্টা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ আইন প্রয়োগের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

১২. প্রত্যেকটি হাসপাতালে শ্রমিক ইউনিয়ন থাকতে হবে, যাতে শ্রমিকরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাতৃত্বকালীন অবস্থায় নারীর জন্য পরিবেশগত ঝুঁকি এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা-সম্পর্কিত কর্মশালা ও সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. বেসরকারি হাসপাতালের অধিকাংশ নারী কর্মী প্রায় ৫০% কর্মী (সারণি-২) নিম্ন মাধ্যমিক পাস হওয়া সত্ত্বেও তারা নারীদের অধিকার, নারী দিবস সম্পর্কে সচেতন নয়। বলতে গেলে তারা প্রায় এসব বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। তাই নিম্ন মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতে এই সব বিষয়ের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যাতে তারা তাদের অধিকারগুলো সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখতে পারে।

আদিবাসী মেয়েদের বিউটি পার্লারে আগমন, তার কারণ এবং বর্তমানে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

–হাসান আল আব্দুল্লাহ

গবেষণা প্রতিবেদন

শিরোনামঃ আদিবাসী নারীদের বিউটি পার্লারে আগমন, তার কারণ এবং বর্তমানে তাদের আর্থ-সমাজিক অবস্থা কী?

দিনে দিনে মানুষ হয়ে উঠছে অধিক রূপ সচেতন আর সেই সাথে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিউটি পার্লার। এই সব বিউটি পার্লারে কাজ করে অসংখ্যা নারীশ্রমিক। আর এই সব নারীশ্রমিকদের বড় অংশ হচ্ছে আদিবাসী নারী। আমি আমার গবেষণাকাজ করতে গিয়ে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১৯টি বিউটি পার্লারে যাই। এই ১৯টি বিউটি পার্লারে কাজ করে প্রায় ৯৩ জন বিউটিশিয়ান যার একটি বড় অংশ হচ্ছে আদিবাসী নারী। এই ৯৩ জন বিউটিশিয়ানের মধ্যে ৫৭ জন হচ্ছে আদিবাসী নারী এবং ৩৬ জন হচ্ছে বাঙালি নারী। আমি এই সব শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রায় ৫০ জনের সাথে কথা বলি এবং তথ্য সংগ্রহ করি। আদিবাসী মেয়েরা আর্থিক অভাব দূর করার জন্য ঢাকায় আসে এবং ছোট-বড় বিউটি পার্লারে কাজে যোগদান করে। আর এভাবেই আদিবাসী মেয়েরা বিউটি পার্লারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

পার্লারে যেসব মেয়েরা কাজ করে এদের অধিকাংশই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলের অধিবাসী। পার্বত্য চট্টগ্রামে সচরাচর ১১টি জনগোষ্ঠী বসবাস করতে দেখা যায়। এরা হলো চাকমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া, চাক, খ্যাং, খুমি ও লুসেই। বাংলাদেশের উত্তরে এবং উত্তর-পূর্বাংশে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক রয়েছে। এদের মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং কোচ এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব গোষ্ঠির আদি এবং অন্যতম পেশা হচ্ছে কৃষিকাজ করা। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সম্পদের বণ্টন, কৃষিজমি হ্রাস পাওয়া, পর্যাপ্ত শস্য উৎপাদন না হওয়া ইত্যাদি কারণে এরা কৃষির ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হচ্ছে। আর আদিবাসী মেয়েরাও ঘরে বসে নেই; তারা পরিবারের সচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে আর বিউটি পার্লার হচ্ছে তাদের অন্যতম পেশা।

আদিবাসী বিউটিশিয়ানদের সম্পর্কে জানতে আমরা ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিউটি পার্লারে যাই এদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা সহজ ছিল না। তবু আমি তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। আদিবাসী বিউটিশিয়ানরা অনেকে এ কাজ করে সন্তুষ্ট থাকলেও একটি বড় অংশ এখনো নানা সমস্যার কারণে সফল হতে পারছে না। যেসব আদিবাসী বিউটিশিয়ান ভালো মালিকের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে তারা ভালো আছে। আর যারা খারাপ মালিকের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে তারা বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে কাজ করছে।

খারাপ মালিকরা তাদের এখানে কর্মরত শ্রমিকদের নানা রকম হুমকি-ধমকি দিয়ে জোরপূর্বক কাজ করায়। তাদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না। এবং অন্যত্র চলে যেতে চাইলে মামলার ভয় দেখায়। এখানে তারা চার দেয়ালে বন্দি জীবন যাপন করছে। যার ফলে উপায়হীন হয়ে তাদের এখানে কাজ করে যেতে হয়।

বিউটিশিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বেতনকাঠামো না থাকায় তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত বেতন প্রদান করা হয় না। তাদের বেতন শুরু হয় ১৫০০/-টাকা থেকে। কিন্তু ৭-৮ বছর কাজ করার পরেও তাদেরকে আশাতীত বেতন দেওয়া হয় না। ফলে এসব আদিবাসী শ্রমিকরা তাদের উপযুক্ত মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে ভেঙে ভেঙে কিস্তিতে বেতন প্রদান করা হয় যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অধিকাংশ বিউটিশিয়ান তাদের মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। এসব বিউটিশিয়ানদের জন্য উপযুক্ত বেতনকাঠামো নির্ধারণ করা হোক।

জীবিকার তাগিদে এসব মেয়েরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে ঢাকায় আসে এবং বিভিন্ন বিউটি পার্লারে কর্মসংস্থান করে। এসব মেয়েরা পারিবারিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এদের অনেকেরই পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অভাবের কারণে তা ত্যাগ করে। তাদের ইচ্ছা, তারা কাজ করে টাকা উপার্জন করবে এবং আর্থিক অভাব দূর করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবে। এক্ষেত্রে অনেকে তাদের স্বপ্নগুলো বাস্তব করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকের ইচ্ছা এই পার্লারে কাজ করার মাধ্যমে স্বপ্ন পূরণের মধ্য দিয়ে বিজয়ের হাসি হাসবে। তাদের একজন হচ্ছেন লাকি (ছদ্মনাম)। লাকির বয়স ২৫ এবং সে মিরপুর ১০ নম্বরের একটি পার্লারে কাজ করে। তার মাসিক আয় হচ্ছে ৫০০০/-টাকা। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি পাস। সে অর্থাভাবে লেখাপড়া না করতে পারলেও তার স্বপ্ন সে তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে শিক্ষিত করে তুলবে এবং তারা চাকরি করে সুন্দর জীবন যাপন করবে। এ স্বপ্ন পূরণে সে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ থেকে সহজে বোঝা যায় এই পার্লারে কাজ করার মাধ্যমে আদিবাসী নারীরা সচেষ্ট হচ্ছে। যদিও কোনো কোনো শ্রমিকের জীবন ধারণ করাই অনেক কষ্টের।

অধিকাংশ আদিবাসী শ্রমিক অল্প শিক্ষিত ও শ্রম আইন সম্পর্কে এদের কোনো ধারণা নেই বললেই চলে। কেউ কেউ শ্রম আইন সম্পর্কে শুনেছে বললেও এ সম্পর্কে এদের কোনো ধারণা নেই বলে জানায়। শ্রম আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় মালিকরা তাদেরকে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অধিক কাজ করায়। শ্রম আইনে সাপ্তাহিক ছুটির বিধান থাকলেও তারা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদেরকে মালিকের ইচ্ছার ওপর বাধ্য থাকতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে আদিবাসী মেয়েরা বিউটিশিয়ানের কাজ করে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। তারা কল্পনা করছে সচ্ছল, সুন্দর জীবনের। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা বিউটি পার্লারে কাজ নিচ্ছে এবং আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের জন্য যদি নিদিষ্ট বেতনকাঠামো থাকত এবং শ্রম আইন মেনে কাজ করানো হতো তবে তারা স্বাবলম্বী হয়ে আর্থিক অভাব দূর করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারত এবং বিউটি পার্লার পেশাকে একটি অন্যতম পেশা হিসেবে উপস্থাপন করত।

কেস স্টাডি-১

ভূমিকা: লাকি (ছদ্মনাম) ২৫ বছরের একটি মেয়ে, তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা, সংসারের অভাব-অনটন মেটানোর জন্য আজ থেকে ০৪ বছর পূর্বে ঢাকায় আসে, বর্তমানে সে মিরপুর ১০ নম্বরের লাবনী হারবাল বিউটি পার্লারে কাজ করছে।

জনমিতিক তথ্য:

নাম	:	লাকি (ছদ্মনাম)
পিতা/স্বামী	:	শিশিল (ছদ্মনাম)
মাতা	:	রুমানা
বয়স	:	২৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এসএসসি
বর্তমান ঠিকানা	:	কাজীপাড়া, মিরপুর-১০, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

পারিবারিক পরিচিতি

পরিবারের সদস্যসংখ্যা

সদস্য	বয়স	শিক্ষা	পেশা	মাসিক আয়
বাবা	৪৬	নিরক্ষর	কৃষি	২৫০০/-
মা	৩৮	নিরক্ষর	গৃহিণী	-‘
বড় ভাই	২৭	৫ম শ্রেণি	টেম্পুর হেলপার	১৬০০/-
ছোট ভাই	১৬	৫ম শ্রেণি	হোটেল বয়	১০০০/-
ছোট বোন	১০	৬ষ্ঠ শ্রেণি	-	-

প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	:	লাবনী হারবাল বিউটি পার্লার, মিরপুর-১০
মালিকের নাম	:	জাহানারা আক্তার

পারিবারিক অবস্থা, ঢাকায় আসার কারণ

লাকি আক্তার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ৪ বছর আগে ঢাকায় আসে। তার বাবা অন্যের জমিতে চাষ করে। ফলে তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে জীবন ধারণ করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। ফলে সে ঢাকায় এসে বিউটি পার্লারে কাজ করে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতায় সাহায্য করছে।

সামাজিক জীবনসংক্রান্ত তথ্যাবলি

লাকি (ছদ্মনাম) কাজীপাড়া একটি মেসে অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে একত্রে থাকে। মাঝে মাঝে সেগ্রামের বাড়িতে যায়। এবং বাবা মায়ের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে।

স্বাস্থ্য, চিকিৎসা

সে অসুস্থ হলে বেশির ভাগ সময় ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খায়, মাঝে মাঝে সরকারি হাসপাতালে যায়।

ন্যূনতম প্রয়োজন

লাকি (ছদ্মনাম) জানায় তার পরিবার একটু ভালো করে থাকা-খাওয়ার জন্য ন্যূনতম মাসিক ১০,০০০/-টাকার প্রয়োজন।

সুপারিশ

লাকি (ছদ্মনাম) তাদের জন্য যদি একটি নির্দিষ্ট বেতনকাঠামো থাকত তাহলে ভালো হতো।

কেস স্টাডি-২

ভূমিকা : রিমা (ছদ্মনাম) ১৮ বছরের একটি মেয়ে। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয় উপজেলা, সংসারের অভাব-অনটন মেটানোর জন্য আজ থেকে ০২ বছর পূর্বে ঢাকায় আসে, বর্তমানে কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড মোড়ে সুরভী বিউটি পার্লারে কাজ করছে।

জনমিতিক তথ্যঃ

নাম	:	রিমা (ছদ্মনাম)
পিতা/স্বামী	:	শফিক (ছদ্মনাম)
মাতা	:	সালমা (ছদ্মনাম)
বয়স	:	১৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৫ম শ্রেণি
বর্তমান ঠিকানা	:	কল্যাণপুর, সুরভী বিউটি পার্লার, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

পারিবারিক পরিচিতি

পরিবারের সদস্যসংখ্যা

সদস্য	বয়স	শিক্ষা	পেশা	মাসিক আয়
বাবা	৫৮	নিরক্ষর	কৃষি	২৭,০০/-
মা	৩৮	নিরক্ষর	গৃহিণী	-
বড় ভাই	২৭	৩য় শ্রেণি	দোকানদার	২,০০০/-
ছোট ভাই	১৫	৫ম শ্রেণি	চা বিক্রেতা	৫০০/-
ছোট বোন (১)	১০	৮ম শ্রেণি	-	-
ছোট বোন (২)	০৫	১ম শ্রেণি	-	-

প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	:	সুরভী বিউটি পার্লার, কল্যাণপুর
মালিকের নাম	:	রুমানা বেগম

পারিবারিক অবস্থা, ঢাকায় আসার কারণঃ

রিমা (ছদ্মনাম) পারিবারিক আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ২ বছর আগে ঢাকায় আসে। তার বাবা অন্যের জমি চাষ করে। ফলে তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জীবন ধারণ করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। ফলে সে ঢাকায় এসে বিউটি পার্লারে কাজ নিয়েছে এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতায় সাহায্য করছে।

সামাজিক জীবন-সংক্রান্ত তথ্যাবলি

রিমা (ছদ্মনাম) কল্যাণপুর তার কর্মস্থল পার্লারের মধ্যে অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে গাদাগাদি করে একত্রে থাকেন। এখানে তাকে খুব কষ্টকর অবস্থায় থাকতে হয়।

স্বাস্থ্য, চিকিৎসা

অসুস্থ হলে বেশির ভাগ সময় ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খায়, মাঝে মাঝে সরকারি হাসপাতালে যায়।

ন্যূনতম প্রয়োজন

সে জানায়, তার পরিবার একটু ভালো করে থাকা-খাওয়ার জন্য ন্যূনতম মাসিক ৮,০০০/- টাকার প্রয়োজন।

সুপারিশ

রিমা (ছদ্মনাম) তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বেতনকাঠামো থাকত তাহলে ভালো হতো।

কেস স্টাডি-৩

ভূমিকাঃ সুমি (ছদ্মনাম) ১২ বছরের একটি মেয়ে। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় সে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আজ থেকে প্রায় ২ বছর আগে ঢাকায় এসে পার্লারে কাজ করা শুরু করে।

জনমিতিক তথ্যঃ

নাম	:	সুমি (ছদ্মনাম)
পিতা/স্বামী	:	আনোয়ার (ছদ্মনাম)
মাতা	:	আসমা (ছদ্মনাম)
বয়স	:	১২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৩য় শ্রেণি
বর্তমান ঠিকানা	:	আজিমপুর, কলোনি, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা	:	মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

পারিবারিক পরিচিতি

পরিবারের সদস্যসংখ্যা

সদস্য	বয়স	শিক্ষা	পেশা	মাসিক আয়
বাবা	৪৬	নিরক্ষর	-	-
মা	৩৬	নিরক্ষর	গৃহিণী	-
বড় ভাই	২৩	৪র্থ শ্রেণি	দোকানদার	-
ছোট ভাই	১৩	৩য় শ্রেণি	-	-
ছোট বোন (১)	৮	২য় শ্রেণি	-	-
ছোট বোন (২)	১	-	-	-

প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : জেনি বিউটি কেয়ার সেন্টার, আজিমপুর, ঢাকা।

মালিকের নাম : শাহানা বেগম

পারিবারিক অবস্থা, ঢাকায় আসার কারণ

সুমি (ছদ্মনাম) পারিবারিক আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ২ বছর আগে ঢাকায় আসে। তার বাবা পঙ্গু বিধায় কোনো কাজ করতে পারে না। ফলে তাদের পরিবার চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জীবন ধারণ করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। ফলে সে ঢাকায় এসে বিউটি পার্লারে কাজ করে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতায় সাহায্য করছে।

সামাজিক জীবন-সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সুমি (ছদ্মনাম) আজিমপুর, ঢাকা তার কর্মস্থল পার্লারের অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে গাদাগাদি করে একত্রে থাকে। এখানে তাকে খুব কষ্টকর অবস্থায় থাকতে হয়।

স্বাস্থ্য, চিকিৎসা

সে অসুস্থ হলে বেশির ভাগ সময় ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খায়, মাঝে মাঝে সরকারি হাসপাতালে যান।

ন্যূনতম প্রয়োজন

সুমি (ছদ্মনাম) জানায়, তার পরিবার একটু ভালো করে থাকা-খাওয়ার জন্য ন্যূনতম মাসিক ১০,০০০/-টাকার প্রয়োজন।

সুপারিশ

সুমি (ছদ্মনাম) জানায়, তাদের জন্য সুন্দর থাকার পরিবেশ হলে ভালো হতো।

❖ **গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সারণিবদ্ধ উপস্থাপন**

৫০ জন শ্রমিকদের ওপর তথ্য সংগ্রহ করে নিম্মোক্ত সারণি তৈরি করা হলোঃ
শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য (সারণি ১-২২)

১। বয়সসংক্রান্ত তথ্য

বয়স	শতকরা
১১-১৫	০২
১৬-২০	৮০
২১-২৫	১৮
	১০০

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা

শ্রেণি	শতকরা
১ম-৫ম	০৮
৬ষ্ট-৮ম	৬৪
৯ম-এস,এস,সি	২৮
	১০০

৩। পরিবারে সদস্য সংক্রান্ত কর্তৃক

সদস্য	শতকরা
১-৫	৫৮
৬-১০	৪২
	১০০

৪। পারিবারিক মাসিক আয়সংক্রান্ত তথ্য

আয়	শতকরা
১-৫০০০	২৬
৫০০০-১০,০০০	৭৪
	১০০

৫। পেশায় আসার কারণসংক্রান্ত তথ্য

কারণ	শতকরা
আর্থিক অভাব	৯৪
অন্যান্য	০৬
	১০০

৬। এই পেশায় আসার পূর্বে অন্য কোনো পেশায় ছিল কি না?

কারণ	শতকরা
হ্যাঁ	০৬
না	৯৪
	১০০

৭। এই পেশায় কিভাবে এলেন?

উত্তর	শতকরা
আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে	৬০
বন্ধুদের মাধ্যমে	৩০
অন্যান্য	১০
	১০০

৮। এই পেশায় আসার পূর্বে ট্রেনিং নিয়েছিল কি না?

উত্তর	শতকরা
ছিল	০৮
ছিল না	৯২
	১০০

৯। কত বছর ধরে এই পেশায় আছেন

সময়কাল	শতকরা
১-৫	৯৬
৬-৮	০৪
	১০০

১০। মাসিক আয় কত?

আয়	শতকরা
১-৪০০০	৪২
৪০০০-৮০০০	৫৮
	১০০

১১। আপনি এই বেতনে সন্তুষ্ট কি না?

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	৩২
না	৬৮
	১০০

১২। প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় কি না?

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	৩৪
না	৬৬
	১০০

১৩। দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করতে হয়-

ঘণ্টা	শতকরা
৮ ঘণ্টা	০২
এর বেশি	৯৮
	১০০

১৪। সাপ্তাহিক ছুটি দেওয়া হয় কি না?

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	১২
না	৮৮
	১০০

১৫। অন্য কোনো কাজে বাধ্য করা হয় কি না?

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	০০
না	১০০
	১০০

১৬। আদিবাসী হিসেবে বৈষম্যের শিকার হন কি না?

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	০০
না	১০০
	১০০

১৭। চাকুরির নিরাপত্তা আছে কি না?

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	১০০
না	০০
	১০০

১৮। পরিবার ও প্রতিবেশীর মনোভাব কেমন?

মনোভাব	শতকরা
ভালো	১০০
মন্দ	০০
	১০০

১৯। এ পেশায় আরো আদিবাসী মেয়েদের আসা উচিত কি না?

উত্তর	শতকরা
আসা উচিত	১০০
আসা উচিত না	০০
	১০০

২০। আপনি কি চান আপনার পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশায় আসুক

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	০৬
না	৯৪
	১০০

২১। অন্য পেশায় যাওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	০৮
না	৯২
	১০০

২২। শ্রম আইন সম্পর্কে ধারণা আছে কি না?

উত্তর	শতকরা
হ্যাঁ	২২
না	৭৮
	১০০

হবিগঞ্জে চা-শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ

–সৈয়দ মোশারফ হোসেন

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। বিগত কয়েক দশক ধরে ক্রমবর্ধমান হারে নারীর কর্মক্ষেত্রে যোগদান বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে চা-বাগানে, নারী চা-শ্রমিকদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে হারে শ্রমবাজারের প্রসার এবং নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে সে হারে কর্মপরিবেশ তৈরি হয়নি। চা-বাগানেও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে নারীরা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের বৈষম্য, নির্যাতন এবং হয়রানির শিকার হচ্ছে। এই অবস্থার নেতিবাচক প্রভাব শুধু এককভাবে নারীর ওউপরই পড়ছে না বরং রাষ্ট্রের পুরো আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপরও পড়ছে।

শ্রম দেয়া এবং সুরক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। চা-শ্রমিকদের ও কাজের পরিবেশ, কাজের শর্ত, মজুরির ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা একমাত্র পেশা হিসেবে চা-বাগানে কাজ করে যাচ্ছে। চা-বাগানেই লেখাপড়া, চিকিৎসা-সেবা পেয়ে যাচ্ছে। দেউন্দী চা-বাগানে একজন ম্যানেজার, একজন ডেপুটি ম্যানেজার, তিন জন কেরানিসহ মোট স্টাফ ৬০ জন। সাধারণ শ্রমিক রয়েছে ১৩৯৫ জন। এরা বিভিন্ন সেক্টরে কাজে নিয়োজিত আছেন। চিকিৎসা-সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন মেডিকেল অফিসার (এমবিবিএস), দুইজন নার্স ও ঔষধ সরবরাহকারী হিসেবে দুইজন নিয়োজিত রয়েছেন। এখানে চা-শ্রমিকদের কাজের পাশাপাশি অসুস্থ শ্রমিক এবং তার সন্তানদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুশ্রম এবং শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বিল্‌স ।

আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব

একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পেশাগত কাজের বিকাশ সাধন ও কার্যকর অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা ও নৈপুণ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও এজেন্সি তত্ত্বাবধায়ক আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেন তা নিম্নরূপ:

- ❖ বিল্‌স-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানা ও পরিচিত হওয়া।
- ❖ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিল্‌স-এর কার্যক্রম এবং বিল্‌স অনুমোদিত চা-বাগানের কার্যক্রমে কাজ করা।
- ❖ চা-শ্রমিকদের শ্রম নিরসন প্রকল্প থেকে যেসব ছেলে বা মেয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে চলে গেছে তাদের বাড়িতে গিয়ে পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া।
- ❖ হবিগঞ্জে চা-বাগানের শ্রমিকদের শ্রম নিরসন প্রকল্পে কাজ করা।
- ❖ যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে চলে গেছে তারা কী অবস্থায় আছে এবং কতটুকু উন্নতি হয়েছে ও তাদের সামাজিক উন্নয়নমূলক পরামর্শ দান করা।
- ❖ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তাদের জীবনযাত্রার কতটুকু উন্নতি সাধন করেছে, তা রিপোর্ট করা।

- ❖ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে কমপক্ষে ৫টি কেস স্টাডি লিপিবদ্ধকরণ।
- ❖ প্রশিক্ষণ গ্রহণার্থীদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ে বৈঠক করা।
- ❖ প্রতিদিনের কার্যাবলি লিপিবদ্ধ করা।
- ❖ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- ❖ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দরিদ্র চা-শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ে পরামর্শ দান করা।

আমার দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলি

একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স-এ গবেষণামূলক কাজ করার জন্য আমার আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল ইতিবাচক। আমি সব সময়ই আন্তরিকভাবে আমার সীমিত সামর্থ্য দিয়ে যারা চা-বাগানের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে, তাদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে জানতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি।

দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমাদের শ্রমিক ও শিশু সমাজ। এদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি একজন সচেতন নাগরিকেরও। তাদের সুনিশ্চিত জীবনের জন্য প্রয়োজন প্রতিকারমূলক, প্রতিরোধমূলক ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ। এই ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

একজন শিশু তার অসহায়ত্বের জন্য দায়ী নয়, বরং দেশের মানুষ, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বাবা-মায়ের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, উদাসীনতা, দায়িত্বহীনতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অসচ্ছলতা ইত্যাদির শিকার। একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে যখন আমার কর্মক্ষেত্র নোয়াপাড়া ও দেউন্দী চা-বাগানে আসি, তাদের এই অসহায় অবস্থা দেখে খারাপ লাগে।

একজন সমাজকর্মী হিসেবে ও একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এই সব অসহায় ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে আমি তাদের পাশে দাঁড়াতে সচেষ্ট হই। পাশাপাশি চা-শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা জানতে পারি।

এই কাজের ক্ষেত্রে আমি সাধারণ কৌশল অবলম্বন ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে আমি আমার সম্পাদিত কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করলাম।

- ❖ এজেন্সি তত্ত্বাবধায়কদের মাধ্যমে বিল্‌স-এর বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে পরিচিত হই।
- ❖ চা-শ্রমিকদের সন্তানদের শিশুশ্রম নিরসন ও শ্রমিকদের মান উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমি প্রকল্পে উপস্থিত হয়ে দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প ত্যাগ করি।
- ❖ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ চলাকালীন আমি দীর্ঘমেয়াদি কেস স্টাডিসমূহ সম্পাদন করেছি।
- ❖ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেও যারা বেকার আছে তাদের বেকারত্ব নিরসনের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছি।

❖ চা-শ্রমিকরা যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে, সেই বিষয়ে কৌশল শিখিয়ে দিয়েছি।

প্রাপ্ত তথ্যসম্পর্কিত আলোচনা

চা-শ্রমিকদের কাজের শর্ত, পরিবেশ, মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন-সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হলো:

আজকের শ্রমিক ও শ্রমিকের সন্তানেরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। কিছু দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে, এতে করে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যে বয়সে ছেলেমেয়েদের থাকার কথা স্কুলে, কিন্তু তারা আজ হয়ত কারো দোকানে, কারো বাসায় অথবা বাগানে কাজ করছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স চা-শ্রমিকদের শ্রমমান নির্ধারণ (মজুরি, কর্মঘণ্টা, চিকিৎসা, বিশ্রাম, নিয়োগপত্র) ইত্যাদি নিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি, শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, নিবন্ধনের ব্যবস্থা, শ্রমিক হত্যা ও নির্যাতনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া চা-বাগানের শ্রমিকদের বাজারদরের সঙ্গে মিল রেখে মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ছুটি ও মাতৃত্বকালীন সময়ে বেতনসহ ছুটির ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই লক্ষ্যে আমি দেউন্দী চা-বাগান ও নোয়াপাড়া চা-বাগানে শ্রমিক-সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরছি।

আমি প্রথমে দেউন্দী চা-বাগানে শ্রমিকদের কাজের শর্ত, পরিবেশ, মজুরি ও ট্রেড ইউনিয়ন-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যাই। সেখানে আমি জানতে পারি চা-শ্রমিকেরা প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে চা-পাতা সংগ্রহ করে। তাদের দৈনন্দিন পারিশ্রমিক ২১ কেজি চা-পাতা পর্যন্ত ৪৮ টাকা। যদি কোনো চা-শ্রমিক ২১ কেজির বেশি চা-পাতা সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে তাকে প্রতি কেজির জন্য ১.৩০ টাকা হারে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, চা-শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সময় মতো প্রদান করা হয়। তাদের সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটিতে তাদের বেতন দেওয়া হয় না। তবে চা-শ্রমিকদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে রেশন হিসেবে ৩.২৫ কেজি আটা পায়। চা-শ্রমিকদের সন্তানদেরও রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। দুইজন সন্তান পর্যন্ত রেশন দেওয়া হয়। এছাড়া চা-শ্রমিকদের জন্য বছরে দুইবার ৬০০x২= ১২০০/- টাকা দেওয়া হয়। চা-শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসা-সেবাও মোটমুটি পর্যাপ্ত।

১. যে মজুরি পান তাতে পরিবারের ভরণপোষণ চলে কি না?

১০%	হ্যাঁ	৯০%	না

২. (না চললে) মজুরি কত প্রয়োজন? গড়ে ১০০ টাকা + বাড়তি সুবিধা।

৩. রেশনের ব্যবস্থা কি আপনার পরিবারের জন্য যথেষ্ট?

১৫%	হ্যাঁ	৮৫%	না

৪. চা-বাগানে চিকিৎসা ব্যবস্থা কি পর্যাপ্ত?

৩০%	হ্যাঁ	৭০%	না

৫. ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সুবিধা পান কি?

৬০%	হ্যাঁ	৪০%	না

মন্তব্য

৪০ জন চা-শ্রমিকদের ওপর গবেষণা জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, পারিশ্রমিক সময়মতো প্রদান করে এর পক্ষে ১০০% উত্তরদাতা হ্যাঁ বলেছেন। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা ও চিকিৎসা-সেবা, ট্রেড ইউনিয়ন সুবিধার ক্ষেত্রে ৬০% উত্তরদাতা না বলেছেন। এই তথ্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, শ্রমিকদের বেতন, চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কিছুটা উদাসীন। যা শ্রমিকদের যথাযথ অধিকারের অন্তরায়। এছাড়া শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক ইউনিয়ন অথবা ট্রেড ইউনিয়নের আরো জোরালো ভূমিকা পালন করা উচিত।

কেস স্টাডি-০১

❖ **পরিচিতি**

নাম	:	দীপক কুমার দাস
পিতার নাম	:	পরিমল কুমার
মাতার নাম	:	অঞ্জলি দেবী
বয়স	:	২৯ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি পাস
ঠিকানা	:	দেউন্দী, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
পরিবারের সদস্যসংখ্যা	:	৪ জন
ধর্ম	:	হিন্দু
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি
কেস স্টাডি গ্রহণের তারিখ	:	০৮/০৭/২০১১

❖ **পরিবার পরিচিতি**

নাম	বয়স	শিক্ষা	পেশা	সম্পর্ক	মাসিক আয়
দীপক কুমার দাস	২৯	এইচএসসি	ঔষধ সরবরাহকারী	নিজ	৬০০০/-
পরিমল কুমার	৫৭	৫ম	কৃষিকাজ	বাবা	২০০০/-
অঞ্জলি দেবী	৫১	বাল্যশিক্ষা	গৃহিণী	মা	-
বিকাশ কুমার	২৫	অষ্টম শ্রেণি	চা-শ্রমিক	ভাই	১৮০০/-

❖ **কেস স্টাডি গ্রহণের যৌক্তিকতা**

দীপক কুমার দাস একজন সচেতন নাগরিক। তার বাবা বর্তমানে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তিনি একজন কর্মজীবী লোক। পূর্বে সে খুব অসহায় ছিল। পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৪ জন। দীপক কুমার দাস চা-বাগানে কাজ করে প্রতি মাসে ৬০০০/- টাকা বেতন পেয়ে সংসার খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে।

❖ **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি**

তথ্য সংগ্রহের কৌশল প্রয়োগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সাক্ষাৎকার। বিল্‌স অফিসে গবেষণাকাজের সঙ্গে জড়িত আছি বলে পরিচয় দিয়ে দীপক কুমার ও তার পরিবার থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। এরপর চা-শ্রমিকদের চা-শ্রম নিরসন প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অবগত হই।

❖ **পারিবারিক অবস্থা:**

দীপক কুমার দাস-এর দেশের বাড়ি বি.বাড়িয়া। তার পিতা দেশের বাড়িতে কৃষিকাজ করতো। তখন তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বর্তমানে পারিবারিক অবস্থা ভালো।

❖ **শারীরিক অবস্থা**

শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে দীপক কুমার দাসের অবস্থা মোটামুটি ভালো। আরো পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এতে করে তার স্বাস্থ্যের আরো উন্নতি হবে। পরিবারের অজ্ঞতার কারণে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।

❖ **মানসিক অবস্থা**

মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে দীপক কুমারের অবস্থা যথেষ্ট ভালো। দীপকের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষণীয়, পারিবারিক অবস্থা যা-ই থাকুক না কেন, সে সব সময় হাসিখুশি থাকে।

❖ **মন্তব্য**

দীপক কুমার দারিদ্র্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার স্বপ্ন রয়েছে জীবনে অনেক বড় হওয়া। বিল্‌স-এর মতো সরকারি, বেসরকারিভাবে সমাজের বিত্তবানরা যদি তাদের পাশে এসে দাঁড়াত তাহলে দীপকের মতো মেধাবী ছেলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হতো।

কেস স্টাডি-০২

❖ **পরিচিতি**

নাম	:	বজেন্দ্র
পিতার নাম	:	নিরঞ্জন রায়
মাতার নাম	:	বেবী রায়
বয়স	:	৩৩ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৫ম শ্রেণি পাস
ঠিকানা	:	দেউন্দী, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
পরিবারের সদস্যসংখ্যা	:	৩ জন
ধর্ম	:	হিন্দু
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি
কেস স্টাডি গ্রহণের তারিখ	:	১১/০৭/২০১১

❖ **পরিবার পরিচিতি**

নাম	বয়স	শিক্ষা	পেশা	সম্পর্ক	মাসিক আয়
বজেন্দ্র	৩৩	৫ম শ্রেণি	চা শ্রমিক	নিজ	৩০০০/-
নিরঞ্জন রায়	৬০	নিরক্ষর	বৃদ্ধ	বাবা	-
বেবী রায়	৫২	নিরক্ষর	গৃহিণী	মা	-

❖ **কেস স্টাডি গ্রহণের যৌক্তিকতা**

বজেন্দ্র একজন সচেতন নাগরিক। তার বাবা বর্তমানে বৃদ্ধ। তিনি একজন কর্মজীবী লোক ছিলেন। পূর্বে সে খুব অসহায় ছিল। পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৩ জন। বজেন্দ্র চা-বাগানে কাজ করে প্রতি মাসে ৩০০০/- টাকা বেতন পেয়ে সংসার খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে।

❖ **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি**

তথ্য সংগ্রহের কৌশল প্রয়োগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সাক্ষাৎকার। বিল্‌স অফিসে গবেষণা কাজের সঙ্গে জড়িত আছি বলে পরিচয় দিয়ে বজেন্দ্র ও তার পরিবার থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। এরপর চা শ্রমিকদের চা শ্রম নিরসন প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অবগত হই।

❖ **পারিবারিক অবস্থা**

বজেন্দ্র-এর দেশের বাড়ি হবিগঞ্জ। তার পিতা দেশের বাড়িতে কৃষিকাজ করতেন। তখন তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বর্তমানে পারিবারিক অবস্থা ভালো।

❖ **শারীরিক অবস্থা**

শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বজেন্দ্র-এর অবস্থা মোটামুটি ভালো। আরো পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এতে করে তার স্বাস্থ্যের আরো উন্নতি হবে। পরিবারের অজ্ঞতার কারণে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।

❖ **মানসিক অবস্থা**

মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে বজেন্দ্র-এর অবস্থা যথেষ্ট ভালো। বজেন্দ্র-এর মধ্যে একটা বিষয় লক্ষণীয় পারিবারিক অবস্থা যা-ই থাকুক না কেন সে সব সময় হাসিখুশি থাকে।

❖ **মন্তব্য**

বজেন্দ্র দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার স্বপ্ন রয়েছে জীবনে অনেক বড় হওয়া। বিল্‌স-এর মতো সরকারি, বেসরকারিভাবে সমাজের বিত্তবানরা যদি তাদের পাশে এসে দাঁড়াত তাহলে বজেন্দ্র-এর মতো মেধাবী ছেলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হতো।

কেস স্টাডি-০৩

❖ **পরিচিতি**

নাম	:	ময়নী সাহা
পিতার নাম	:	চন্দন দেব
মাতার নাম	:	পূজা
বয়স	:	৫০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	২য় শ্রেণি পাস
ঠিকানা	:	দেউন্দী, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
পরিবারের সদস্যসংখ্যা	:	২ জন
ধর্ম	:	হিন্দু
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি
কেস স্টাডি গ্রহণের তারিখ	:	১৫/০৭/২০১১

❖ **পরিবার পরিচিতিঃ**

নাম	বয়স	শিক্ষা	পেশা	সম্পর্ক	মাসিক আয়
ময়নী সাহা	৫০	২য় শ্রেণি	চা-শ্রমিক	নিজ	২৫০০/-
উর্মি সাহা	৪৫	নিরক্ষর	চা-শ্রমিক	বোন	২৫০০/-

❖ **কেস স্টাডি গ্রহণের যৌক্তিকতা**

ময়নী সাহার বাবা-মা কেউ নেই। তারা দুই বোন চা-বাগানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তিনি একজন কর্মজীবী মহিলা। তিনি ছোট বোনকে বড় করতে গিয়ে নিজে বিয়ে করেননি। বর্তমানে একা জীবন যাপন করছেন এবং তার দিনকাল ভালো যাচ্ছে।

❖ **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি**

তথ্য সংগ্রহের কৌশল প্রয়োগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সাক্ষাৎকার। বিল্‌স অফিসে গবেষণাকাজের সঙ্গে জড়িত আছি বলে পরিচয় দিয়ে ময়নী সাহা ও তার বোনের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। এরপর চা-শ্রমিকদের চা-শ্রম নিরসন প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অবগত হই।

❖ **পারিবারিক অবস্থা**

ময়নী সাহা বর্তমানে চা-বাগানে থাকেন। তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। তার পিতামাতা কেউ জীবিত নেই। তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। তার বাবা-মা মারা যাবার পরে তারা এই চা-বাগানে এসে কাজে যোগ দেন। বর্তমানে পারিবারিক অবস্থা ভালো।

❖ **শারীরিক অবস্থা**

শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে ময়নী সাহার অবস্থা কিছুটা ভালো। আরো পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এতে করে তার স্বাস্থ্যের আরো উন্নতি হবে। চাহিদামতো আয়ের অভাবে তিনি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারেন না।

❖ **মানসিক অবস্থা**

মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে ময়নী সাহা খুবই দুর্বল। ময়নী সাহার মধ্যে একটা বিষয় লক্ষণীয়, পারিবারিক অবস্থা যা-ই থাকুক না কেন, তিনি সব সময় বোনকে কাছে রেখে একত্রে বসবাস করে আসছেন।

❖ **মন্তব্য**

প্রতিটি কাজের শেষে সফলতা ও ব্যর্থতা কতটুকু হলো তার মূল্যায়নের আবশ্যকতা রয়েছে। ময়নী সাহা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার স্বপ্ন রয়েছে জীবনে অনেক বড় হওয়ার। বিল্‌স-এর মতো সরকারি, বেসরকারিভাবে

সমাজের বিত্তবানরা যদি তাদের পাশে এসে দাঁড়াত তাহলে ময়নী সাহার মতো নারীদের/মহিলাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হতো।

কেস স্টাডি-০৪

❖ **পরিচিতি**

নাম	:	রুহুল আমীন
পিতার নাম	:	হাবিবুর রহমান
মাতার নাম	:	সুমি অক্তার
বয়স	:	৪০ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৮ম শ্রেণি পাস
ঠিকানা	:	দেউন্দী, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
পরিবারের সদস্যসংখ্যা	:	৫ জন
ধর্ম	:	ইসলাম
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি
কেস স্টাডি গ্রহণের তারিখ	:	২১/০৭/২০১১

❖ **পরিবার পরিচিতি**

নাম	বয়স	শিক্ষা	পেশা	সম্পর্ক	মাসিক আয়
রুহুল আমীন	৪০	৮ম শ্রেণি	চা-শ্রমিক	নিজ	২৫০০/-
আমিনা বেগম	৩২	৫ম শ্রেণি	গৃহিণী	স্ত্রী	-
কবির হোসেন	১২	৫ম শ্রেণি	ছাত্র	ছেলে	-
মনির হোসেন	০৭	২য় শ্রেণি	ছাত্র	ছেলে	-
রুমি আক্তার	০৩	-	-	মেয়ে	-

❖ **কেস স্টাডি গ্রহণের যৌক্তিকতা**

রুহুল আমীন-এর বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। তার পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৫ জন। তার দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হয়। বর্তমানে সে খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে। সবদিক বিবেচনা করে আমি তাকে কেস হিসেবে গ্রহণ করেছি।

❖ **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি**

রুহুল ও তার পরিবারের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করি। এছাড়া চা-শ্রমিকদের শ্রমমান নির্ধারণ (মজুরি, কর্মঘণ্টা, চিকিৎসা, বিশ্রাম, রেশনিং ব্যবস্থা) ইত্যাদি ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি।

❖ **পারিবারিক অবস্থা**

রুহুল আমীন একজন ২৫০০/- টাকা বেতনের সামান্য চা-শ্রমিক। তার পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৫ জন। তাদের নিয়ে রুহুল আমীনের সংসার চালাতে খুব কষ্ট হয়। কোনো কোনো সময় তাকে না খেয়ে কাজ করতে হয়।

❖ **শারীরিক অবস্থা**

রুহুল আমীন শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে খুবই দুর্বল প্রকৃতির। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দিন দিন তার শরীর ভেঙে যাচ্ছে এবং সে মাঝে মাঝে অসুস্থ বোধ করে এবং অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বিশ্রাম নেয়।

❖ **মানসিক অবস্থা**

মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে রুহুল আমীন খুবই দুর্বল। রুহুল আমীন-এর আর্থিক অবস্থার কারণে সে মানসিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। সমাজকর্মী হিসেবে আমি তাকে চা-বাগানে কাজের পাশাপাশি অন্য কিছু করার পরামর্শ দেই। এতে রুহুল আমীন মনে সাহস পেয়ে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। এবং তাকে তার ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া করানোর পরামর্শ দেই।

❖ **মন্তব্য**

রুহুল আমীন বর্তমানে খুবই অসহায় অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছে। তবে আমি তাকে পরামর্শ দেওয়ার পর তার মানসিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। এবং সন্তানদের লেখাপড়া ও চা-বাগানের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের ওপর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কেস স্টাডি-০৫

❖ **কেস পরিচিতি**

নাম	:	সিলা রানী
পিতার নাম	:	জগদিশ বাবু
মাতার নাম	:	আলু মনি
বয়স	:	৩৯ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	নাই
ঠিকানা	:	নোয়াপাড়া, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
পরিবারের সদস্যসংখ্যা	:	৩ জন
ধর্ম	:	হিন্দু
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি
কেস স্টাডি গ্রহণের তারিখ	:	০৪/০৮/২০১১

❖ **পরিবার পরিচিতি**

নাম	বয়স	শিক্ষা	পেশা	সম্পর্ক	মাসিক আয়
সিলা রানী	৩৯	নাই	চা-শ্রমিক	নিজ	২৫০০/-
দেবাশীস পাল	৪৫	নাই	চা-শ্রমিক	স্বামী	২৫০০/-
প্রবীতা	১৫	৮ম শ্রেণি	ছাত্রী	মেয়ে	-

❖ **কেস গ্রহণের যৌক্তিকতাঃ**

সিলা রানী ও তার স্বামী উভয়ই চা-বাগানের শ্রমিক। তার পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৩ জন। তারা উভয়ই অশিক্ষিত হওয়ার কারণে তাদের একমাত্র মেয়েকে লেখাপড়া করাবেন বলে পণ করে। তাদের পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। সবদিক বিবেচনা করে আমি তাকে কেস স্টাডি হিসেবে গ্রহণ করি।

❖ **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি**

সিলা রানী ও তার পরিবারের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করি। এছাড়া চা-শ্রমিকদের শ্রমমান নির্ধারণ (মজুরি, কর্মঘণ্টা, চিকিৎসা, বিশ্রাম, রেশনিং ব্যবস্থা) ইত্যাদি ব্যাপারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি।

❖ **পারিবারিক অবস্থা**

সিলা রানী একজন ২৫০০/- টাকা বেতনের সামান্য চা-শ্রমিক। তার পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৩ জন। তাদের এক সন্তানকে নিয়ে তারা ভালোভাবে সংসার চালাচ্ছেন। তবে কোনো অসুস্থতার কারণে বেশি টাকার প্রয়োজন হলে তারা খুবই সমস্যায় পড়েন।

❖ **মানসিক অবস্থা**

মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে সিলা রানী খুবই ভালো। কেননা তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরি করে। তাদের দিনকাল ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছে এবং মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে তারা একটু চিন্তিত। কিভাবে মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়।

❖ **মন্তব্য**

প্রতিটি কাজের সফলতা ও ব্যর্থতা রয়েছে। এই সফলতা ও ব্যর্থতা কতটুকু হলো তার মূল্যায়নের আবশ্যকতা রয়েছে। সিলা রানীর সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তার সাথে পেশাগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সিলা রানী তার মেয়েকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখে, তা বাস্তবে রূপদান হোক, সেটাই আমার কামনা। আর সে সফল হলে সেটাই হবে আমার কাজের সার্থকতা।

গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষঃ কারণ, প্রভাব ও উত্তরণের উপায়ঃ একটি সমীক্ষা

–কাওসার হোসাইন

গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ

আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও মূলত ব্যাপক উদ্বৃত্ত নারী শ্রমের কল্যাণে গত ত্রিশ বছরে নবীন উদ্যোক্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বছরে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প। রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান ও ব্যাপকতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি হিসেবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক গঠনকাঠামোতে পোশাকশিল্পের রয়েছে নিয়ামক ভূমিকা। বিস্তারিত বললে এই খাত বাংলাদেশকে প্রদান করছে রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ; প্রায় চার হাজারের বেশি কারখানায় নিয়োজিত রয়েছে প্রায় চল্লিশ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী; বিকশিত করেছে মুদ্রণ-প্যাকেজিং-টেক্সটাইল-ব্যাংক-বীমা-পরিবহন-খাদ্যসহ অগ্র-পশ্চাৎ শিল্প ও সেবা খাতের বিপুল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

ধারণা করা হয়, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় দুই কোটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পোশাকশিল্পের সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। ব্যালেন্স অব পেমেন্টের গুরুত্ব বিবেচনা করলে বলতে হবে ধনী-মধ্যবিত্ত-গরিবসহ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর পুরোটাই এই শিল্পের সুবিধাভোগী। মতাদর্শনির্ভর নয়া উদারনীতিবাদী কর্পোরেট বিশ্বায়নের ইচ্ছানিরপেক্ষ নির্দেশনায়, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ কতিপয় দাতাদের তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক পরিচালিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ক্রমহ্রাসমানতার কারণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার যেখানে আক্রান্ত হবার কথা, সীমাহীন নৈরাজ্যকর অস্থিরতায় সেখানে পোশাকশিল্প এনে দিয়েছে কিছুটা স্থিতাবস্থা।

দীর্ঘদিন ধরে মালিক পক্ষের সংগঠন বিজিএমইএ তাদের সদস্যদেরকে প্রচলিত শ্রম আইনের ভিত্তিতে আইনসম্মতভাবে কারখানা পরিচালনা করাতে ব্যর্থ হবার পরিপ্রেক্ষিতে সূচিত ও বিস্ফোরিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন।

মালিক ও রাষ্ট্রপক্ষ কারখানায় শ্রমিকের ট্রেড-ইউনিয়ন গঠনে ধারাবাহিকভাবে বাধা প্রদান করায় এবং দীর্ঘদিন ধরে মালিক ও রাষ্ট্রপক্ষের সাথে শ্রমিকদের নিয়মতান্ত্রিক দরকষাকষির কোনো সুযোগ না থাকায় স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বহীন বিস্ফোরণ ঘটে। ***(পোশাকশিল্পে শ্রম অসন্তোষঃ মাত্রা, কারণ ও প্রতিকার- জিয়াউল হক মুক্তা, পরিচালক, কর্মজীবী নারী)***

শ্রমিক অসন্তোষের উৎপত্তি

শ্রমিক অসন্তোষ তথা আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরনো। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে মহান মে দিবসের ঘটনা সারা দুনিয়াকে নাড়িয়ে দেয়, যা আজও মহান মে দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বৃটিশ ভারতে শ্রম আন্দোলন শুরু হয় ১৮৫৭ সাল

থেকে। এর ধারাবাহিকতায় গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনাও বেশ পুরানো। মূলত গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ বিষয়টিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের পরিচয় খুবই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। ***(শ্রম কল্যাণ, শিল্প সম্পর্ক ও শ্রমিক আন্দোলন- মো. আলী খাঁন)***

শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়

গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়টিকে প্রধান দুটি ধারায় দেখা যেতে পারে–

- ❖ নন-ইপিজেড কারখানায় শ্রমিকদের দাবির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে মজুরি বৃদ্ধি, কর্মঘণ্টা কমানো ও সাপ্তাহিক ছুটিসহ বিভিন্ন দাবি। এসব দাবিতে বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।
- ❖ ইপিজেড কারখানা শ্রমিকদের দাবির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে ডলারের তুল্যমূল্যে মজুরি প্রদান, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি, হাজিরা বোনাস, নাস্তা ভাতা, চিকিৎসা ও পরিবহন ভাতা/ব্যবস্থা, ৮ ঘণ্টার শিফ্‌ট, ওভারটাইমের মজুরি স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ করা, বেপজার দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অপসারণ করা ইত্যাদি।

তবে এর মধ্যে আবার নিট/সোয়েটার ও ওভেন কারখানার প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে সামনে চলে এসেছে, বিশেষত বিজিএমইএ বিভিন্ন সভায় সোয়েটার কারখানাগুলোকে যখন অসন্তোষ বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করা হয়েছে। পিস রেটে মজুরি নিয়ে সৃষ্ট অসন্তোষই বহু জায়গায় শ্রমিক বিস্ফোরণে বারুদের ভূমিকা পালন করছে। জানা যায়, আগে মালিকপক্ষ কাজ শুরুর আগেই পিস রেটে মজুরির পরিমাণ জানিয়ে দিতেন, সম্প্রতি তারা তা আগে জানান না, বরং কাজ শেষ হবার পর তা হিসাব করেন। ***(পোশাকশিল্পে শ্রম অসন্তোষ: মাত্রা, কারণ ও প্রতিকার- জিয়াউল হক মুক্তা, পরিচালক, কর্মজীবী নারী)***

শ্রমিক অসন্তোষের বর্তমান প্রেক্ষিত

পুলিশ লাঠিপেটা করছে একজন নারীশ্রমিককে। শ্রমিকরা রাস্তায় আন্দোলন করছে সরকার ঘোষিত নির্ধারিত বেতন পরিশোধের দাবিতে। ভাঙচুর করেছে কারখানার একাংশ এবং জ্বালাচ্ছে গাড়ি। বাংলাদেশে সব মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে এই সব ঘটনা। এতে অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যে একধরনের নেগেটিভ ধারণা হয়েছে। কেউ শ্রমিকদের দোষ দিচ্ছেন। কেউ মালিক পক্ষকে দোষারোপ করছেন। আবার কেউ বলেছেন সরকার সফলতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে সামাল দিতে পারছে না। এ সবই ভাবনার কথা।

বাংলাদেশে প্রায় চার হাজারের মতো তৈরি পোশাকশিল্প গড়ে উঠেছে এবং সেই সব শিল্পের অঞ্চলভিত্তিক মূল অবস্থান হচ্ছে ঢাকা ইপিজেড, সাভার, গাজীপুর, টঙ্গী, মিরপুর, মালিবাগ, রামপুরা, তেজগাঁও, মোহাম্মপুর, শ্যামলী, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও রূপগঞ্জ। অপরদিকে চট্টগ্রামে ইপিজেড ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চল। বর্ধিত বেতনকাঠামোর দাবিতে শ্রমিকরা যেসব অঞ্চলগুলোতে দাবি আদায়ের নামে আন্দোলনে নেমেছে, সেগুলো হলো : ঢাকা ও চট্টগ্রামের ইপিজেড, রূপনগর, সাভার ও গাজীপুর এবং তেজগাঁও, কুড়িল এলাকা। আর যেসব শ্রমিক পথে নেমে এসেছে, সেসব শ্রমিক কিছু উল্লেযোগ্য নামকরা কারখানায় কাজ করেন। যেমন ইয়ংওয়ান, নাসা গ্রুপ, রবিন টেক্স, গিভেন্সী গ্রুপ ইত্যাদি। এদের মূল দাবি ছিল নতুন

বেতনকাঠামোর কারণে যেসব সুবিধাদি বাতিল করা হয়েছে, তা পুনরায় চালু করা। পুরোনো বা দক্ষ শ্রমিকদের বেতন তুলনামূলকভাবে নতুনদের বা অদক্ষদের চেয়ে কম বেড়েছে, এর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। দাবিগুলো কিন্তু যৌক্তিক।

২০০৬ সালে ঘোষিত শ্রমিকদের বেতনকাঠামো বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় খুবই অপ্রতুল হওয়ায় অনেক কারখানার কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সুবিধাদি বা ভাতা প্রদান করে আসছিলেন। অন্যদের তুলনায় নিজেকে এগিয়ে রাখছিলেন। দক্ষ শ্রমিকদের বা পুরাতন শ্রমিকদের বেতন কেন কম এই দাবিটির পেছনেও যথোপযুক্ত যুক্তি রয়েছে। কেননা সরকার যেভাবে পাঁচটি ধাপে শ্রমিকদের বেতনকাঠামো বিন্যস্ত করেছে তা হলো ৭ম গ্রেডের শ্রমিকরা পাবেন ১৬৬২ টাকার পরিবর্তে ৩০০০ টাকা, যা প্রায় ৮১ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ গ্রেডের শ্রমিকরা পাবেন ১৮৫১-এর পরিবর্তে ৩৩২২ টাকা যা ৮০ ভাগ বেশি, ৫ম গ্রেডে বৃদ্ধি পেয়েছে ২০৪৬ টাকা থেকে ৩৫৫৩ টাকা, যা ৭৪ ভাগ বেশি, ৪র্থ গ্রেডে বৃদ্ধি করা হয়েছে ২২৫০ থেকে ৩৮৬১ টাকা, যা ৭২ ভাগ বেশি এবং সর্বোচ্চ গ্রেড ৩য় গ্রেডে বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৪৪৯ থেকে ৪২১৮ টাকায়, অর্থাৎ ৭২ ভাগ বেশি। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে, তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের অনুপাত হচ্ছে ৭৭ এবং ২৩, অর্থাৎ দক্ষ বা কাজ জানা শ্রমিকের আধিক্য বেশি। এই ৭৭ ভাগ শ্রমিককেই সরকার ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী বেতন দেয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের কাজের পারদর্শিতা বা অভিজ্ঞতা বা কাজে যোগদানের বয়স বিবেচনায় আনা হয় নাই বলেই শ্রমিকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বা বিক্ষোভ করেছে। ২৪৪৯ টাকায় গত দুই বছর যাবৎ কখনোই কোনো দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়নি। যদিও ২০০৬ সালের ঘোষিত বেতনকাঠামো অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন হওয়া উচিত ছিল ২৪৪৯ টাকা। কিন্তু বাজারমূল্যের সাথে তাল রেখে প্রায় সবগুলো কারখানাতেই দক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগ হতো ৩০০০ টাকা থেকে প্রায় ৪৫০০ টাকা পর্যন্ত। যা সবগুলো কারখানাই নিজস্ব পর্যালোচনা, মানবিক বিবেচনায়। শ্রমিকদের চাহিদানুযায়ী বা শ্রমিক স্বল্পতার কারণে নিয়োগ শুরু করেছে ৩০০০ টাকা থেকে প্রায় ৪০০০ পর্যন্ত, কেউ কেউ ৪৫০০ পর্যন্ত মজুরি দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যূনতম বেতনকাঠামো। যেখানে বলা আছে, ৪২১৮ টাকা হচ্ছে একজন দক্ষ বা ৩য় গ্রেডের শ্রমিকের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি।

এখানে যে ঘটনাটি হয়েছে তা হলো, কেউ কেউ ৩০০০ থেকে ৪০০০ পর্যন্ত সকলকেই ৪২১৮ টাকায় ফিক্সড করে দিয়েছেন। এখানেই হয়েছে যত গন্ডগোল বা কেউ কেউ দু-তিন ধাপে ফিক্সড করেছেন। ধরা যাক ৩০০০ থেকে ৩৪০০ টাকাকে করা হয়েছে ৪২১৮ টাকা, ৩৫০০ থেকে ৩৯০০-কে করা হয়েছে ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৪২৬৮ টাকা। আবার ৩৯০০ টাকা থেকে বেশি যারা পেতেন, তাদের করা হয়েছে ৪৩১৮ টাকা। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপের বা ভাগের শ্রমিকদের বেতন গড়পড়তায় মিলিয়ে ফেলা সঠিক হয়নি। একজন শ্রমিকের সাথে দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার কারণে অন্য এক শ্রমিকের যেরূপ পার্থক্য ছিল তা সঠিকভাবে নতুন প্রদেয় কাঠামোতে প্রতিফলিত করতে পারেনি কারখানার কর্তৃপক্ষ বা মালিকপক্ষ। তাই এই অসন্তোষ বা বিক্ষোভ। সুতরাং পুনর্বিবেচনা করে তা অবশ্যই করতে হবে।

বিক্ষোভ যেন ভাঙচুর বা জ্বালাও-পোড়াও না হয়, সেদিকে অবশ্যই শ্রমিকদের খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি সরকারি শিল্প পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও তা খেয়াল রাখতে হবে। সর্বোপরি যে কোনো সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত। এবং এই আলোচনা বা দরকষাকষির জন্য অবশ্যই প্রতিটি কারখানার শ্রমিক কল্যাণ কমিটি বা শ্রমিকদের অংশগ্রহণসহ কমিটি থাকা অতি প্রয়োজন। ২০০৬ সালের পোশাক তৈরি শিল্পের রপ্তানি আয় বেড়ে বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ। যা উত্তোত্তর বৃদ্ধি পাবে আগামীতে। সুতরাং কারখানা পরিচালনার জন্য যেমন দক্ষ শ্রমিক দরকার, তেমনি দরকার ব্যবস্থাপনা পরিষদ বা দক্ষ ব্যবস্থাপক। ***(বকুল আশরাফ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯.১২.১০)***

শ্রমিক অসন্তোষের কারণ

দেশের শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ **(বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১১)** বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হচ্ছে তৈরি পোশাকশিল্প। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই শিল্প ইতোমধ্যেই অন্যতম শিল্প হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ দেশের জনগণের, বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানে এই শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। আর তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিল্পের বিকাশ তথা এই শিল্পকে দৃঢ় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে আমাদের সকলকে।

বিপুল সম্ভাবনার এই শিল্প শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অনেকে মনে করেন, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কারণে বাংলাদেশের পোশাক-শিল্প আজ হুমকির মুখে। কিন্তু আমাদের খুঁজে বের করতে হবে শ্রমিক অসন্তোষ কেন হচ্ছে। নিম্নে শ্রমিক অসন্তোষ-এর কারণসমূহ তুলে ধরা হলো :

- ❖ স্বল্প মজুরি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে তাল মিলিয়ে শ্রমিকের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি না পাওয়া;
- ❖ অসামঞ্জস্য মজুরি এবং দেরিতে মজুরি প্রদান করা;
- ❖ মাতৃত্বকালীন ছুটি/সুবিধা না থাকা এবং ছুটির ব্যবস্থা কম থাকা;
- ❖ শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত ওভারটাইম করিয়ে ঠিকমতো বা সময়মতো ওভারটাইম ভাতা এবং মজুরি প্রদান না করা;
- ❖ অসন্তোষজনক কর্মপরিবেশ;
- ❖ কাজের মাঝে বিরতি কম থাকা;
- ❖ মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক শ্রমিকদের সাথে অমানবিক ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার করা;
- ❖ সরকারের আন্তরিকতার অভাব;
- ❖ প্রতারণামূলক পিছ রেট;
- ❖ শ্রমিকদের প্রমাণস্বরূপ পরিচয়পত্র ইস্যু না করা;
- ❖ শ্রমিকদের ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত ইত্যাদির মাধ্যমে হয়রানি করা;
- ❖ বাস্তবমুখী কারিগরি শিক্ষার অভাবে দক্ষ জনশক্তির অভাব;
- ❖ ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের শ্রম আইনবিষয়ক অজ্ঞতা;

❖ মালিকদের অধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা ইত্যাদি।

শ্রমিক অসন্তোষের প্রভাব

জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাবার কারণে সারা মাস ঘামঝরা পরিশ্রম করে একজন শ্রমিক যখন কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না তার ওপর ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক দুর্ব্যবহার, বেতন পেতে দেরি, ওভারটাইম ভাতা সম্পূর্ণ না পাওয়াসহ বিভিন্ন নেতিবাচক পরিস্থিতি যখন একজন শ্রমিক মোকাবেলা করতে থাকে, তার এক পর্যায়ে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে, এটা স্বাভাবিক। আর এ কারণেই শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হয়। আর এই শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শ্রমিক, মালিক, সমাজ বা রাষ্ট্রে নানা ধরনের প্রভাব পড়ে। এগুলো হলো :

❖ শ্রমিকরা চাকুরিচ্যুত হয়;
❖ শ্রমিকদের বেতন কর্তন করা হয়;
❖ শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে;
❖ শ্রমিকরা হয়রানিমূলক মামলার শিকার হয়;
❖ রপ্তানি হ্রাস পায়;
❖ উৎপাদন হ্রাস পায়;
❖ শ্রমিকরা মালিকপক্ষের হুমকির শিকার হয়;
❖ সময়মতো অর্ডার সরবরাহ করা যায় না, ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়;
❖ মালিকদের মুনাফা কমে যায়, ফলে মালিক পক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়;
❖ সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়;
❖ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হ্রাস পায়, ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় কমে যায়;
❖ আইনশৃঙ্খলার অবনতি দেখা যায়;
❖ জিডিপি হ্রাস পায়, আর্থ-সামাজিক জীবনে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়।

শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে মালিক-শ্রমিক-সরকার পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি

মালিক-শ্রমিক-সরকার পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির বিষয়াবলি :

❖ সকল শ্রমিককে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে;
❖ প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী সকল শ্রমিককে সপ্তাহে একদিন সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করা হবে এবং অন্যান্য সকল ছুটি প্রদান নিশ্চিত করা হবে;
❖ প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী সকল নারীশ্রমিককে বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হবে;
❖ নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমিকদের দিয়ে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো হলে শ্রম আইন অনুযায়ী [অর্থাৎ স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ] ওভারটাইম ভাতা প্রদান করা হবে; এবং
❖ প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা প্রদান করা হবে না;

সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন তদারকি করার জন্য মালিকপক্ষ শ্রমিকপক্ষের সমন্বয়ে দ্বিপক্ষীক মনিটরিং কমিটি গঠন করার ব্যাপারে একমত পোষণ করা হয়।

উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও মালিক-শ্রমিক-সরকারপক্ষ [দুই একটি ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ] আরও যেসব বিষয়ে ঐকমত্য উপনীত হন সেগুলো হলো :

- ❖ শ্রমিক-কর্মচারীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনমুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
- ❖ শ্রমিককে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-কে কারখানার ক্লিনিক উন্নত করা হবে;
- ❖ গর্মেন্টস পল্লী স্থাপন ও শ্রমিকদের আবাসন সমস্যার সমাধানে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ যৌথভাবে সরকারের কাছে আবেদন জানাবে;
- ❖ পোশাকশিল্প বিকাশে তৈরি পোশাকের শুল্কমুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার, বন্দর সমস্যার সমাধান এবং লেবার কোড ৯৪-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে অবিলম্বে পাশের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে; এবং
- ❖ কারখানা মাস্তান ও চাঁদাবাজমুক্ত রাখতে হবে ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ সাপেক্ষে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

চুক্তিতে ক্ষতিপূরণ ভাতা, আপরাপর আইনানুগ সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা উপকরণ, শ্রম সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছাতে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ পরবর্তীতে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ***(বকুল আশরাফ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০.১১.২০০৬)***

শ্রমিক অসন্তোষ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ

প্রায় সোয়া ১ কোটি মানুষ এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ ভাগ। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প প্রবেশ করে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে। এ সময় থেকে সারা বিশ্বেই কোটা প্রথা বাতিল হয়ে যায়। ওই সুবিধা হারানোর পরও সময়োচিত লবিং এবং চেষ্টার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেফগার্ড মেকানিজমের মাধ্যমে চীনের আমদানি কমিয়ে দেয়। ফলে বাংলাদেশে প্রচুর রপ্তানি আদেশ আসতে থাকে। উদ্যোক্তারা আবার নতুন উদ্যোগে কারখানা চালু করে এবং একই সঙ্গে বিদেশি উদ্যোক্তারা এ দেশে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ করে যাচ্ছেন। আশির দশকে যে শিল্পের পথ চলা শুরু, আজ তা দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি সেক্টরে পরিণত হয়েছে। ***(গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ: প্রাসঙ্গিক ভাবনা, ড. নেয়ামুল বশির মজুমদার)*** তাই যে কোনো মূল্যে এই শিল্পকে বাঁচাতে হবে। শ্রমিক অসন্তোষ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ হলো :

- ❖ মালিকপক্ষের বুঝতে হবে যে, শ্রমিকদের সস্তা শ্রমকে কেন্দ্র করেই এদেশে আশির দশকে গার্মেন্টস শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। শ্রমিকরা বাঁচার জন্য চাকরি করে। তাদের

ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণপূর্বক অন্যান্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী বাজার বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক মাসিক মজুরি স্থির করতে হবে;

- ❖ যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়ন/সংস্কার এবং শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তা দিতে হবে;
- ❖ মিড-লেভেল ম্যানেজমেন্টকে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য মালিক দায়ী করবেন। এর ফলে মিড-লেভেল ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকের সাথে ভালো ব্যবহার করবে;
- ❖ মালিক কারখানা পরিদর্শন করে শ্রমিকদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করবে, যা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে;
- ❖ কারখানার পরিবেশ উন্নত করতে হবে;
- ❖ অতিরিক্ত অর্থাৎ ৮ ঘণ্টার ঊর্ধ্বের কাজের জন্য মূল বেতনের দ্বিগুণ বেতন দিতে হবে এবং কোনোক্রমেই তা কমানো যাবে না;
- ❖ শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং নারীশ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটির বিধান রাখতে হবে;
- ❖ গার্মেন্টস শিল্পকে অস্থিতিশীল করার জন্য একটি মহল শ্রমিক হত্যা, গুমের মতো গুজব ছড়ায়, যা মিথ্যা উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে। এ ব্যাপারে মালিক, শ্রমিক ও সরকারি বিভিন্ন এজেন্সির সজাগ থাকতে হবে;
- ❖ নারীশ্রমিকদের দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুসারে অধিক রাত পর্যন্ত কাজ করানো যাবে না;
- ❖ শ্রমিকদের চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়া বা চাকরিচ্যুত করার নিয়ম আইনের আওতায় আনতে হবে। কোনো ধরনের নোটিশ ছাড়া একতরফাভাবে একজন শ্রমিক চাকরি ছেড়ে দিলে তাকে যেন আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং একইভাবে একজন শ্রমিককে ছাঁটাই করলে, সে যেন তার প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা ভোগ করতে পারে, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে;
- ❖ মালিক-শ্রমিক-সরকার পক্ষের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা করতে হবে;
- ❖ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ মামলা না করে তাদের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে এর সুষ্ঠু মীমাংসা করতে হবে;
- ❖ শ্রম দপ্তর নিয়মিত মনিটরিং-এর মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ উদ্‌ঘাটন করে তা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে;
- ❖ শ্রম দপ্তর শ্রম আইনবিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইন বিষয়ে সচেতন করে তুলবে;
- ❖ প্রত্যেক পোশাকশিল্প কারখানায় পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করতে হবে।

তথ্যাবলি বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

উত্তরদাতাদের তথ্যাবলি বিশ্লেষণ

সারণি-১। উত্তরদাতাদের বয়সসংক্রন্ত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের বয়স (বছর)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১৫-২০	১৪	১৮.৬৭
২০-২৫	২৫	৩৩.৩৩
২৫-৩০	১৬	২১.৩৩
৩০-৩৫	১০	১৩.৩৩
৩৫-৪০	৬	৮.০০
৪০-ঊর্ধ্বে	৪	৫.৩৩
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণার তথ্য হতে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাগণের মধ্যে শতকরা ১৮.৬৭ উত্তরদাতার বয়স ১৫-২০ বছরের মধ্যে, ৩৩.৩৩% উত্তরদাতার বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে, ২১.৩৩% উত্তরদাতার বয়স ২৫-৩০ বছরের মধ্যে, ১৩.৩৩% উত্তরদাতার বয়স ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে, ৮.০০% উত্তরদাতার বয়স ৩৫-৪০ বছরের মধ্যে এবং ৫.৩৩% উত্তরদাতার বয়স ৪০ বা তার ঊর্ধ্বে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে, যাদের শতকরা হার ৩৩.৩৩।

সারণি-২। উত্তরদাতাদের লিঙ্গসংক্রন্ত তথ্যাবলি

লিঙ্গ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষ	৩৫	৪৬.৬৭
মহিলা	৪০	৫৩.৩৩
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণার তথ্য হতে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাগণের মধ্যে শতকরা ৪৬.৬৭% পুরুষ। তাছাড়া শতকরা ৫৩.৩৩ মহিলা। এতে বোঝা যায় যে গার্মেন্টস শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি।

সারণি-৩। উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রন্ত তথ্যাবলি

শিক্ষাগত যোগ্যতা/শ্রেণি	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১ম-৫ম	১৫	২০.০০
৬ষ্ঠ-১০ম	২৫	৩৩.৩৩
এসএসসি	২৩	৩০.৬৭
এইচএসসি থেকে ঊর্ধ্বে	১২	১৬.০০
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, উত্তরদাতার মধ্যে ২০.০০% ১ম-৫ম শ্রেণি, ৩৩.৩৩% ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি, ৩০.৬৭% মাধ্যমিক, ১৬.০০% উচ্চ মাধ্যমিক বা তার ঊর্ধ্বে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি বা সমমান পর্যায়ের।

সারণি-৪। উত্তরদাতাদের মাসিক আয়সংক্রন্ত তথ্যাবলি

মাসিক আয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৩০০০-৪৫০০	৩৬	৪৮.০০
৪৫০০-৬০০০	১৪	১৮.৬৭
৬০০০-৭৫০০	১১	১৪.৬৭
৭৫০০-৯০০০	৯	১২.০০
৯০০০-ঊর্ধ্বে	৫	৬.৬৬
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণার তথ্য হতে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাগণের মধ্যে শতকরা ৪৮.০০ উত্তরদাতার মাসিক আয় ৩০০০-৪৫০০ টাকার মধ্যে, শতকরা ১৮.৬৭ উত্তরদাতার মাসিক আয় ৪৫০০-৬০০০ টাকার মধ্যে, শতকরা ১৪.৬৭ উত্তরদাতার মাসিক আয় ৬০০০-৭৫০০ টাকার মধ্যে, শতকরা ১২.০০ উত্তরদাতার মাসিক আয় ৭৫০০-৯০০০ টাকার মধ্যে এবং শতকরা ৬.৬৬ উত্তরদাতার মাসিক আয় ৯০০০ টাকা বা তার ঊর্ধ্বে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার মাসিক আয় ৩০০০-৪৫০০ টাকার মধ্যে, যার শতকরা হার ৪৮.০০।

সারণি-৫। উত্তরদাতাদের বর্তমান পেশায় সন্তুষ্টি সংক্রন্ত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
খুব সন্তুষ্ট	৬	৮.০০
সন্তুষ্ট	৯	১২.০০
মোটামুটি সন্তুষ্ট	৫০	৬৬.৬৭
সন্তুষ্ট নয়	১০	১৩.৩৩
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা মাত্র ৮.০০ উত্তরদাতা তাদের বর্তমান পেশায় খুব সন্তুষ্ট। শতকরা ১২.০০ উত্তরদাতা তাদের বর্তমান পেশায় শুধু সন্তুষ্ট। তাছাড়া শতকরা ৬৬.৬৭% উত্তরদাতা তাদের বর্তমান পেশা নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং শতকরা ১৩.৩৩ উত্তরদাতা তাদের বর্তমান পেশা নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নয়। এতে বোঝা যায় যে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকেরা তাদের পেশা নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট, যা শতকরা ৬৬.৬৭।

সারণি-৬। উত্তরদাতারা শ্রমিক অসন্তোষ সম্পর্কে কিছু জানে কি না সে-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬৫	৮৬.৬৭
না	১০	১৩.৩৩
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাগণের মধ্যে ৮৬.৬৭% উত্তরদাতাই শ্রমিক অসন্তোষ সম্পর্কে জানে এবং ১৩.৩৩% উত্তরদাতা শ্রমিক অসন্তোষ সম্পর্কে কিছু জানে না।

সারণি-৭। ইতোপূর্বে শ্রমিক অসন্তোষমূলক কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৫	৩৩.৩৩
না	৫০	৬৬.৬৭
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণার তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা ৩৩.৩৩ উত্তরদাতাই ইতোপূর্বে শ্রমিক অসন্তোষমূলক কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং শতকরা ৬৬.৬৭ উত্তরদাতা ইতোপূর্বে শ্রমিক অসন্তোষমূলক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি।

সারণি-৮। শ্রমিক অসন্তোষের কারণ-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শ্রমিক অসন্তোষের কারণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
অসামঞ্জস্যমূলক মজুরি	৪৯	৬৫.৩৩
দেরিতে মজুরি প্রদান	৬৯	৯২.০০
ছুটির ব্যবস্থা কম	২৩	৩০.৬৭
ওভারটাইমের টাকা যথা সময়ে না দেওয়া	৩০	৪০.০০
শ্রমিক ছাঁটাই	২৮	৩৭.৩৩
মাতৃত্বকালীন ছুটি/সুবিধা না থাকা	১৭	২২.৬৭
মালিক পক্ষের দুর্ব্যবহার	২৭	৩৬.০০
কাজের মাঝে বিরতি কম থাকা	১৯	৩২.০০
মালিকদের অধিক মুনাফা	২৬	৩৩.৩৩
অসন্তোষজনক কর্মপরিবেশ	১১	১৪.৬৭
নিয়োগপত্র ইস্যু না করা	১৫	২০.০০
মোট	৩১৮ (৭৫)	৪২৩.৯৯

*একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৫.৩৩% মনে করে, অসামঞ্জস্যমূলক মজুরির কারণে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে, ৯২.০০% মনে করে দেরিতে মজুরি প্রদান, ৩০.৬৭% মনে করে ছুটির ব্যবস্থা কম, ৪০.০০% মনে

করে ওভারটাইমের টাকা যথাসময়ে না দেয়া, ৩৭.৩৩% মনে করে শ্রমিক ছাঁটাই, ২২.৬৭% মনে করে মাতৃত্বকালীন ছুটি/সুবিধা না থাকা, ৩৬.০০% মনে করে মালিক পক্ষের দুর্ব্যবহার, ৩২.০০% মনে করে কাজের মাঝে বিরতি কম থাকা, ৩৩.৩৩% মনে করে মালিকদের অধিক মুনাফা, ১৪.৬৭ মনে করে অসন্তোষজনক কর্মপরিবেশ, ২০.০০% মনে করে নিয়োগপত্র ইস্যু না করার কারণে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা (৯২.০০%) মনে করে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনার প্রধান কারণ হলো দেরিতে মজুরি প্রদান।

সারণি-৯। শ্রমিকের প্রতিদিন কর্মস্থানে বাধ্যতামূলক কর্মঘণ্টা-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

কর্মঘণ্টা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৬-৮	০০	০.০০
৮-১০	৩৪	৪৫.৩৩
১০-১২	৪১	৫৪.৬৭
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাগণের মধ্যে ৪৫.৩৩% শ্রমিকের প্রতিদিন কর্মস্থলে ৮-১০ ঘণ্টা বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হয় এবং ৫৪.৬৭% শ্রমিকের প্রতিদিন কর্মস্থলে ১০-১২ ঘণ্টা বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হয়। গবেষণায় আরও দেখা যায় কোন শ্রমিকই প্রতিদিন কর্মস্থলে ৬-৮ ঘণ্টা কাজ করে না।

সারণি-১০। ওভারটাইম-এর ব্যবস্থা আছে কি না সে-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬৬	৮৮.০০
না	৯	১২.০০
মোট	৭৫	১০০.০০

উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা ৮৮.০০ উত্তরদাতা বলেছেন, ওভারটাইম ব্যবস্থা আছে এবং শতকরা ১২.০০ উত্তরদাতা বলেছেন, ওভারটাইম ব্যবস্থা নেই।

সারণি-১১। শ্রমিকরা কত ঘণ্টা ওভারটাইম করে সে-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

ওভারটাইম (ঘণ্টা)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
২ ঘণ্টা	৪১	৫৪.৬৭
৩ ঘণ্টা	১৮	২৪.০০
৪ ঘণ্টা	৭	৯.৩৩
৫ ঘণ্টার উর্ধ্বে	০	০.০০
মোট	৬৬ (৭৫)	১০০.০০

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাগণের মধ্যে ৫৪.৬৭% শ্রমিক দৈনিক ২ ঘণ্টা ওভারটাইম করে, ২৪.০০% শ্রমিক দৈনিক ৩ ঘণ্টা ওভারটাইম করে এবং ৯.৩৩% শ্রমিক দৈনিক ৪ ঘণ্টা ওভারটাইম করে। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৪.৬৭%) বলেছেন, তারা দৈনিক ২ ঘণ্টা ওভারটাইম করেন।

সারণি-১২। শ্রমিকদের ওভারটাইম কাজের বেতন-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মূল বেতনের সমান	৪৫	৬০.০০
মানসম্মত	২১	২৮.০০
মোট	৬৬ (৭৫)	৮৮.০০

উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা ৬০.০০ উত্তরদাতা বলেছেন ওভারটাইম কাজের বেতন দেওয়া হয় মূল বেতনের সমান এবং শতকরা ২৮.০০% উত্তরদাতা বলেছেন ওভারটাইম কাজের বেতন দেওয়া হয় মানসম্মত।

সারণি-১৩। শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ	গণসংখ্যা*	শতকরা হার
কর্মবিরতি	৭০	৯৩.৩৩
রাস্তাঘাট ও কর্মস্থল অবরোধ	৪৮	৬৪.০০
দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ভাঙচুর	৫০	৬৬.৬৭
ধর্মঘট	৩৯	৫২.০০
সভা-সমাবেশ	৩৯	৫২.০০
আন্দোলন	৩৯	৫২.০০
মোট	২৮৫ (৭৫)	৩৮০.০০

*একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৩.৩৩% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কর্ম-বিরতির মাধ্যমে, ৬৪.০০% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাস্তাঘাট ও কর্মস্থল অবরোধের মাধ্যমে, ৬৬.৬৭% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ভাঙচুরের মাধ্যমে, ৫২.০০% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ধর্মঘটের মাধ্যমে, ৫২.০০% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে এবং ৫২.০০% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আন্দোলনের মাধ্যমে। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৩.৩৩%) মনে করে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কর্মবিরতির মাধ্যমে।

সারণি-১৪। শ্রমিকদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লিখিত চুক্তি-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩৩	৪৪.০০
না	৪২	৫৬.০০
মোট	৭৫	১০০.০০

উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা ৪৪.০০ উত্তরদাতা বলেছেন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লিখিত চুক্তি আছে এবং শতকরা ৫৬.০০ উত্তরদাতা বলেছেন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের কোনো লিখিত চুক্তি নেই।

সারণি-১৫। চুক্তির সবগুলো শর্ত পূরণ হচ্ছে কি না সে-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

চুক্তির শর্ত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সবগুলো পূরণ হচ্ছে	২৩	৩০.৬৭
কিছু কিছু পূরণ হচ্ছে	১০	১৩.৩৩
কোনোটিই পূরণ হচ্ছে না	০০	০.০০
মোট	৩৩ (৭৫)	৪৪.০০

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাগণের মধ্যে ৩০.৬৭% বলেছেন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লিখিত চুক্তির সবগুলো শর্ত পূরণ হচ্ছে এবং ১৩.৩৩% উত্তরদাতা বলেছেন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লিখিত চুক্তির কিছু কিছু পূরণ হচ্ছে।

সারণি-১৬। কারখানার কর্মপরিবেশ সম্পর্কে উত্তরদাতার মতামত-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতার মতামত	বাথরুম/টয়লেট	বিশুদ্ধ খাবার পানি	আলো বাতাস	বিশ্রামের ব্যবস্থা
	গণসংখ্যা (শতকরা হার)	গণসংখ্যা (শতকরা হার)	গণসংখ্যা (শতকরা হার)	গণসংখ্যা (শতকরা হার)
সন্তোষজনক	৩৭ (৪৯.৩৩)	৩৫ (৪৬.৬৭)	২৪ (৩২.০০)	২৮ (৩৭.৩৩)
মোটামুটি	৩৪ (৪৫.৩৩)	৩৬ (৪৮.০০)	২৬ (৩৪.৬৭)	১৮ (২৪.০০)
সন্তোষজনক নয়	৪ (৫.৩৩)	৪ (৫.৩৩)	২৫ (৩৩.৩৩)	২৯ (৩৮.৬৭)
মোট	৭৫ (১০০)	৭৫ (১০০)	৭৫ (১০০)	৭৫ (১০০)

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে কারখানার কর্মপরিবেশের অন্তর্ভুক্ত বাথরুম/টয়লেট সম্পর্কে ৪৯.৩৩% উত্তরদাতা বলেছেন সন্তোষজনক, ৪৫.৩৩% বলেছেন মোটামুটি এবং ৫.৩৩% উত্তরদাতা বলেছেন সন্তোষজনক নয়। বিশুদ্ধ খাবার পানি সম্পর্কে ৪৬.৬৭% উত্তরদাতা বলেছেন সন্তোষজনক, ৪৫.৩৩% বলেছেন মোটামুটি, এবং ৫.৩৩% উত্তরদাতা বলেছেন সন্তোষজনক নয়। আলো-বাতাসের ব্যবস্থা সম্পর্কে ৩২.০০% উত্তরদাতা বলেছেন সন্তোষজনক, ৩৪.৬৭% বলেছেন মোটামুটি এবং ৩৩.৩৩% উত্তরদাতা বলেছেন সন্তোষজনক নয়। বিশ্রামের ব্যবস্থা সম্পর্কে ৩৭.৩৩% উত্তরদাতা বলেছেন সন্তোষজনক, ২৪.০০% বলেছেন মোটামুটি এবং ৩৮.৬৭% বলেছেন সন্তোষজনক নয়।

সারণি-১৭। শ্রমিকদের অসন্তোষের পেছনে রাজনৈতিক বা বিভিন্ন মহলের ইন্ধন-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩৯	৫২.০০
না	৩৬	৪৮.০০
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫২.০০% বলেছেন শ্রমিক অসন্তোষের পেছনে রাজনৈতিক বা বিভিন্ন মহলের ইন্ধন রয়েছে এবং ৪৮.০০% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের পেছনে রাজনৈতিক বা বিভিন্ন মহলের ইন্ধন নেই।

সারণি-১৮। শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা একজন শ্রমিকের জীবনে যে প্রভাব ফেলে সে-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শ্রমিকের জীবনে প্রভাব	গণসংখ্যা*	শতকরা হার
চাকুরিচ্যুত হওয়া	৫২	৬৯.৩৪
বেতন কর্তন	৪৫	৬০.০০
নিরাপত্তাহীনতা	৫০	৬৬.৬৬
গ্রেফতার ও মামলা	৩৫	৪৬.৬৬
অন্যান্য	০০	০.০০
মোট	১৮২ (৭৫)	২৪২.৬৬

* একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে

উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা ৬৯.৩৪ উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে তারা চাকুরিচ্যুত হয়েছেন, ৬০.০০% উত্তরদাতা মনে করেন বেতন কর্তন হয়, ৬৬.৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং ৪৬.৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন তারা গ্রেফতার ও মামলার শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা (৬৯.৩৪%) মনে করে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক আসন্তোষের কারণে তারা চাকুরিচ্যুত হয়েছেন।

সারণি-১৯। শ্রমিক অসন্তোষের ফলে যারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শ্রেণি/পক্ষ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
শ্রমিক শ্রেণি	৩০	৪০.০০
মালিক শ্রেণি	০০	০.০০
উভয় পক্ষ	৪৫	৬০.০০
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা	০০	০.০০
মোট	৭৫	১০০.০০

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪০.০০% উত্তরদাতা বলেছেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শুধু শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাছাড়া ৬০.০০% উত্তরদাতা বলেছেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সারণি-২০। রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে শ্রমিক অসন্তোষের বিরূপ প্রভাব পড়ে কি না সে-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬১	৮১.৩৩
না	১৪	১৮.৬৭
মোট	৭৫	১০০.০০

উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, শতকরা ৮১.৩৩ উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং শতকরা ১৮.৬৭ উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ে

সারণি-২১। রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে শ্রমিক অসন্তোষের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতাদের মতামত	গণসংখ্যা*	শতকরা হার
আইনশৃঙ্খলার অবনতি	৪৫	৬০.০০
সামাজিক বিশৃঙ্খলা	৫০	৬৬.৬৬
উৎপাদন হ্রাস পাওয়া	৫২	৬৯.৩৩
রপ্তানি হ্রাস	৪৩	৫৭.৩৩
মোট	১৯০ (৭৫)	২৫৩.৩২

* একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০.০০% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়, ৬৬.৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ৬৯.৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ৫৭.৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে রপ্তানি হ্রাস পায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে উৎপাদন হ্রাস পায়, যার শতকরা হার ৬৯.৩৩।

সারণি-২২। শ্রমিক অসন্তোষ থেকে উত্তরণের/দূরীকরণের উপায়-সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরণের/দূরীকরণের উপায়	গণসংখ্যা*	শতকরা হার
যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়ন/সংস্কার	৪৯	৬৫.৩৩
বেতন-ভাতা সন্তোষজনক করা	৬২	৮২.৬৬
কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন	৫৬	৭৪.৬৭
ত্রিপক্ষীয় আলোচনা	৪০	৫৩.৩৩
মোট	২০৭ (৭৫)	২৭৫.৯৯

* একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে

উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য হতে দেখা যায় যে, শ্রমিক অসন্তোষ থেকে উত্তরণের/দূরীকরণের যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার মধ্যে যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়ন/সংস্কারে মতামত দেয় ৬৫.৩৩% উত্তরদাতা, ৮২.৬৬% উত্তরদাতা বেতন-ভাতা সন্তোষজনক করার কথা বলেন, ৭৪.৬৭% উত্তরদাতা কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন করার কথা বলেন এবং ৫৩.৩৩% উত্তরদাতা ত্রিপক্ষীয় আলোচনা করার কথা বলেন।

সারণি-২৩। শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে মালিকদের ভূমিকাসম্পর্কিত তথ্যাবলি

মালিকদের ভূমিকা	গণসংখ্যা*	শতকরা হার
সময়মতো বেতন পরিশোধ	৬৮	৯০.৬৬
ভালো ব্যবহার করা	৪০	৫৩.৩৪
চাকুরির নিরাপত্তা	৩৯	৫২.০০
মোট	১৪৭ (৭৫)	১৯৬.০০

* একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে মালিকদের ভূমিকা সম্পর্কে ৯০.৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন সময়মতো বেতন পরিশোধ করা, ৫৩.৩৪% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং ৫২.০০% উত্তরদাতা মনে করেন চাকুরির নিরাপত্তা দেওয়া। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন (৯০.৬৬%) মালিকরা সময়মতো বেতন পরিশোধ করলে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন করা সম্ভব।

সারণি-২৪। শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়নের কোনো ভূমিকা আছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উত্তরদাতার মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৯	৬৫.৩৩
না	২৬	৩৪.৬৭
মোট	৭৫	১০০.০০

উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে ৬৫.৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা আছে এবং অন্যদিকে ৩৪.৬৭% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়নের কোন ভূমিকা নেই।

সারণি-২৫। শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাসম্পর্কিত তথ্যাবলি

ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা	গণসংখ্যা*	শতকরা হার
শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা	৪৩	৫৭.৩৩
শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা	৪৯	৬৫.৩৩
শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা	৪১	৫৪.৬৭
মোট	১৩৩ (৭৫)	১৭৭.৩৩

* একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে ৫৭.৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করা, ৬৫.৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং ৫৪.৬৭% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা করা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা হলো শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, যাদের শতকরা হার ৬৫.৩৩।

সার্বিক পর্যালোচনা ও ফলাফল

গবেষণার **পর্যালোচনা ও ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :**

- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক (শতকরা ৩৩.৩৩) উত্তরদাতার বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে। আর এ বয়সের শ্রমিকরা কোনো ধরনের অন্যায়, অবিচার সহজে মেনে নিতে পারে না। তাই মালিকপক্ষের যেকোনো ধরনের অন্যায়, অবিচারের ফলে শ্রমিকরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, যার ফলে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।
- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৬.০০% উত্তরদাতার মাসিক আয় ৩০০০-৪৫০০০ টাকার মধ্যে। এই মাসিক আয় বর্তমান বাজারমূল্যে একজন মানুষের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য যথেষ্ট নয়। আর এই স্বল্প মজুরিই গার্মেন্ট শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত। সেই সাথে **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩** এবং **লিটারেচার রিভিউ**তেও এই স্বল্প মজুরিকেই গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৫.৩৩% মনে করে, অসামঞ্জস্যমূলক মজুরির কারণে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে, ৯২.০০% মনে করে দেরিতে মজুরি প্রদান, ৩০.৬৭% মনে করে ছুটির ব্যবস্থা কম, ৪০.০০% মনে করে ওভারটাইমের টাকা যথাসময়ে না দেয়া, ৩৭.৩৩% মনে করে শ্রমিক ছাঁটাই, ২২.৬৭% মনে করে মাতৃত্বকালীন ছুটি/সুবিধা না থাকা, ৩৬.০০% মনে করে মালিকপক্ষের দুর্ব্যবহার, ৩২.০০% মনে করে কাজের মাঝে বিরতি কম থাকা, ৩৩.৩৩% মনে করে মালিকদের অধিক মুনাফা, ১৪.৬৭ মনে করে অসন্তোষজনক কর্মপরিবেশ, ২০.০০% মনে করে নিয়োগপত্র ইস্যু না করার কারণে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। সেই সাথে **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩** এবং **লিটারেচার রিভিউ**তে গার্মেন্ট শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের প্রধান কারণ হিসেবে কম মজুরি, দেরিতে মজুরি পরিশোধ করা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও মালিকদের দুর্ব্যবহার, ওভারটাইমের টাকা সময়মতো পরিশোধ না করা, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, প্রতারণামূলক পিছ রেট, অসামঞ্জস্যমূলক মজুরি, বিভিন্ন মহলের উস্কানি, ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের শ্রম আইনবিষয়ক অজ্ঞতা, মালিকদের অধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা,

শ্রমিকদের প্রমাণস্বরূপ পরিচয়পত্র ইস্যু না করা, সরকারের আন্তরিকতার অভাব, বাস্তবমুখী কারিগরি শিক্ষার অভাবে অদক্ষ জনশক্তির/শ্রমিকের যোগ্যতার চেয়ে বেশি মজুরি প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে।

- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩** এ গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের প্রধান কারণ হিসেবে কম মজুরি, দেরিতে মজুরি পরিশোধ করা এবং বিনা কারণে শ্রমকি ছাঁটাই এই তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।
- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪.৬৭% শ্রমিকের প্রতিদিন কর্মস্থানে ১০-১২ ঘণ্টা বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হয়। অতিরিক্ত সময় কাজ করানোর ব্যাপারে শ্রমিকদের সম্মতি নেয়া হয় না। শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হয় এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে বেতন দেয়া হয় না, যার ফলে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।
- ❖ উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা ৬০.০০ উত্তরদাতা বলেছেন ওভারটাইম কাজের বেতন দেওয়া হয় মূল বেতনের সমান এবং শতকরা ২৮.০০ উত্তরদাতা বলেছেন ওভারটাইম কাজের বেতন দেওয়া হয় মানসম্মত। যেহেতু সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক ওভারটাইম কাজের বেতন মূল বেতনের দ্বিগুণ যা আইনত মালিক দিতে বাধ্য তা শ্রমিকরা পায় না। সে কারণেও গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। সেই সাথে **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩**-এর তথ্য প্রদানকারীরাও এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।
- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৩.৩৩% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কর্মবিরতির মাধ্যমে, ৬৪.০০% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাস্তাঘাট ও কর্মস্থল অবরোধের মাধ্যমে, ৯৩.৩৩% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কর্মবিরতির মাধ্যমে, ৬৬.৬৭% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ভাঙচুরের মাধ্যমে, ৫২.০০% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ধর্মঘটের মাধ্যমে, ৫২.০০% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে এবং ৫২.০০% মনে করে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আন্দোলনের মাধ্যমে। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৩.৩৩%) মনে করে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কর্মবিরতির মাধ্যমে। সেই সাথে **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩**-এর তথ্য থেকে জানা যায় কর্মবিরতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাস্তা-ঘাট অবরোধ, মিছিল-মিটিং, সমাবেশ, ভাঙচুর প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
- ❖ উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য হতে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫৬.০০ উত্তরদাতা বলেছেন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের কোনো লিখিত চুক্তি নেই। ফলে মালিকপক্ষ বিনা কারণে শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারে, যা শ্রমিক অসন্তোষকে ত্বরান্বিত করে। সেই সাথে **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩**-এর তথ্য প্রদানকারীরাও এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

- ❖ উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য হতে দেখা যায় যে, শতকরা ৬৯.৩৪ উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে তারা চাকুরিচ্যুত হয়েছেন, ৬০.০০% উত্তরদাতা মনে করেন বেতন কর্তন হয়, ৬৬.৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং ৪৬.৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন তারা গ্রেফতার ও মামলার শিকার হয়েছেন। সেই সাথে **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩-এর তথ্য থেকে জানা যায়** শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শ্রমিকরা বেতন কম পায়, গ্রেফতার ও মামলার শিকার হয়, চাকুরি চলে যায়, জখম হয়, মালিকপক্ষের হুমকির শিকার হয় এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।
- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪০.০০% উত্তরদাতা বলেছেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শুধু শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাছাড়া ৬০.০০% উত্তরদাতা বলেছেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সাথে কে.আই.আই ১, ২ ও ৩-এর তথ্য প্রদানকারীরা এই ব্যাপারে বলেছেন মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ, মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই শ্রমিক অসন্তোষের ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ❖ উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, শতকরা ৮১.৩৩ উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং সেই সাথে **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩** এবং **লিটারেচার রিভিউ**-তে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে শ্রম অসন্তোষের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হ্রাস পায় ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় কমে যাওয়া, আইনশৃঙ্খলার অবনতি প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।
- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, শ্রমিক অসন্তোষ থেকে উত্তরণের/দূরীকরণের যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তার মধ্যে যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়ন/সংস্কারে মতামত দেয় ৬৫.৩৩% উত্তরদাতা, ৮২.৬৬% উত্তরদাতা বেতন-ভাতা সন্তোষজনক করার কথা বলেন, ৭৪.৬৭% উত্তরদাতা কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন করার কথা বলেন এবং ৫৩.৩৩% উত্তরদাতা ত্রিপক্ষীয় আলোচনা করার কথা বলেন। সেই সাথে **কে.আই.আই ১, ২ ও ৩** এবং **লিটারেচার রিভিউ**-তে শ্রমিক অসন্তোষ থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে বেতন-ভাতা সন্তোষজনক করা, কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন করা, যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, বিনা কারণে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা, শ্রমিকদের যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা না করে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা, মালিক-শ্রমিক-সরকারপক্ষের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা, সময়মতো বেতন প্রদান করা, ছুটি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। নারীশ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটির বিধান রাখা, অতিরিক্ত কাজের জন্য মূল বেতনের দ্বিগুণ বেতন প্রদান করা প্রভৃতি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে।

- ❖ গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকদের ভূমিকা সম্পর্কে ৯০.৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন সময়মতো বেতন পরিশোধ করা, ৫৩.৩৪% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং ৫২.০০% উত্তরদাতা মনে করেন চাকুরির নিরাপত্তা দেওয়া। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা (৯০.৬৬%) মনে করেন মালিকরা সময়মতো বেতন পরিশোধ করলে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন করা সম্ভব। সেই সাথে কে.আই.আই ১, ২ ও ৩-এর তথ্য প্রদানকারীরাও এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।
- ❖ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে ৫৭.৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করা, ৬৫.৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং ৫৪.৬৭% উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা করা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম ভূমিকা হলো শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। এক্ষেত্রে ***কে.আই.আই-৩-এর তথ্য প্রদানকারী বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স ওয়ার্কার্স ফেডারেশন-এর জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মো: শহিদুল্লাহ বাদল*** , একমত পোষণ করেন। কিন্তু অন্য দুজন তথ্য প্রদানকারী (কে.আই.আই ১ ও ২) এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন।

কাঠশিল্প-শ্রমিকদের ওপর পরিচালিত গবেষণা

–মো. আরিফুর রহমান

সাহিত্য সমীক্ষা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের কাঠশিল্প, কুটিরশিল্প থেকে বিস্তৃতি লাভ করেছে। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের কাঠশিল্প যন্ত্রচালিত উৎপাদনশিল্পে রূপান্তরিত হয়। সে অনুসারেই কাঠশিল্প ক্রমান্বয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নতুন নতুন নকশা এবং নানাবিধ উপাদান ব্যবহার করা শুরু করে। কাঠশিল্পে সেগুন কাঠের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বিভিন্ন কাঁচামালের মাধ্যমে কাঠশিল্পে প্রস্তুতির চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন উৎপাদন যন্ত্রপাতির কাঠ প্রক্রিয়াজাত করে, MDF, লেমিনেটেড বোর্ড, পার্টিকেল বোর্ড, বাঁশ, শ্রমসিদ্ধ লোহার আসবাবপত্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বাসায় ব্যবহারের জন্য মানুষ এখনো কাঠকে বেছে নিলেও কাঠের সাথে অন্যান্য উপাদান যেমন- বেত, বেয়ন, লেমিনেটেড বোর্ড, ফ্লাইওড এবং এম.ডি.এফ এখন দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ফার্নিচারের মধ্যে ৭০% বাসার জন্য তৈরি এবং ৩০% অফিসে ব্যবহার করা হয়। কাঠশিল্প-শ্রমিকরা সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারের মজুরিকাঠামোর আইন কাঠশিল্প-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এর ধারা ১৪০-এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের ধারা ১৩৯-এর অধীন "নির্মাণ ও কাঠ" শিল্প সেক্টর, অতঃপর উক্ত সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিকদের জন্য "নিম্নতম মজুরি বোর্ড" কর্তৃক সুপারিশকৃত মজুরিকাঠামো তুলে ধরা হলো:

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	এলাকা	মাসিক মূল্য মজুরি (টাকা)	মাসিক বাড়ি ভাড়া (মূল মজুরির ৩৫%)	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	মাসিক যাতায়াত ভাতা	মাসিক সর্বমোট মজুরি	দৈনিক মজুরি
কাঠমিস্ত্রি	শহর অঞ্চল	১১,১০০/-	৩,৮৮৫/-	৪০০/-	২০০/-	১৫,৫৮৫/-	৬০০/-
	গ্রাম অঞ্চল	১০,২০০/-	৩৫৭০/-	৪০০/-	২০০/-	১৪,৩৭০/-	৫৫০/-

বাংলাদেশ ১৯৯৫ সাল থেকে ফার্নিচার রপ্তানি করা শুরু করে। আশা করা হচ্ছে, ২০১৫ সালের মধ্যে ফার্নিচার শিল্প থেকে ৪০ মিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব হবে । বিশ্বে কাঠশিল্পের শ্রমিক খরচ মোট আয়ের ৪০% হলেও বাংলাদেশে শ্রমিক খরচ মোট আয়ের ২০%। বাংলাদেশ সরকার এদেশের ফার্নিচার শিল্পকে Trust Sector হিসেবে ঘোষণা করেছে । G.D.P.-তে প্রতিবছর গড়ে এর অবদান ০.২৯%, যেখানে ২ লক্ষ দক্ষ এবং

মোটামুটি দক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। বাংলাদেশ ফার্নিচার প্রতিষ্ঠান BFLOA-এর মতে, বাংলাদেশে ফার্নিচার ফ্যাক্টরির সংখ্যা ২৮,০০০টি । যার মধ্যে ১৯৫২টি প্রতিষ্ঠান BFLOA-এর নিবন্ধনকৃত ।
(উৎস: ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রির জরিপ)

বাংলাদেশে ৯,৯১৩টি কাঠের, ২,৬২৮টি কাঠ ছাড়া অন্যান্য ফার্নিচার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে ১,১৯,৮১০ জন কর্মজীবী মানুষ কাজ করছে। (খান নেসার, ড. আলী : ২০১১) আবার ১,২০,০০০ জন মানুষ ফার্নিচার তৈরি করতে এবং ২,০০,০০০ মানুষ কাঁচামাল প্রস্তুত সামগ্রী সংগ্রহ ও সহায়তা করার কাজে নিয়োজিত আছে। উল্লেখ্য যে, এদের মধ্যে প্রায় ১,০০,০০০ নারী। এই নারীর মধ্যে ২০% কাজ করে বড় ইন্ডাস্ট্রিতে, ৪০% কাজ করে SME-তে। ঢাকা শহরে যে সকল ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– বাড্ডা, সূত্রাপুর, ও মিরপুরের ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রি। বড় বড় কোম্পানিগুলোর অধিকাংশ ফ্যাক্টরিই সাভার ও গাজীপুরে অবস্থিত। বাংলাদেশে ১৫টি প্রতিষ্ঠান ফার্নিচারের ব্যবসা করছে। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- অটবি, নাভানা, হাতিল, আখতার, পার্টেক্স ব্রাদার্স প্রভৃতি। বাংলাদেশের কাঠশ্রমিকরা স-মিল, বোর্ড ফ্যাক্টরিজ, পেনেল উৎপাদন ফ্যাক্টরিসহ বিভিন্ন দরজা, জানালা ও ফার্নিচার তৈরি কারক প্রতিষ্ঠান কাজ করে। বাংলাদেশের বর্তমানের বিভিন্ন ফার্নিচার অনলাইন-ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। যেমন- বিক্রয় ডটকম, সেল বাজার প্রভৃতির মাধ্যমে অনলাইনে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় হচ্ছে।

বাংলাদেশের ফার্নিচার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি করছে। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্য, গলফ কান্ট্রিজ প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করছে। এছাড়া এশিয়ান দেশসমূহের যেমন– ভারত, জাপান, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের তৈরি করা ফার্নিচার রপ্তানি করা হচ্ছে। তবে ফার্নিচার তৈরির কাঁচামালের প্রায় ৬০% বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশ আমদানি করে। যেমন– টিক, গামার এবং শক্ত কাঠ আফ্রিকা থেকে আসছে। ওক কাঠ এবং বার্মাটিক কাঠ মায়ানমার থেকে আমদানি করা হয়। আশা করা যায়, বাংলাদেশের উৎপাদন রেট ৯.৫৫ ----হলে চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ২০%। বাংলাদেশ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৯.৩ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। বাংলাদেশের কাঠশিল্পের আমদানি ও রপ্তানির চিত্র দেখানো হলো :

অর্থবছর	মিলিয়ন (ডলার)
২০০৫-২০০৭	৮.১৬
২০০৭-২০০৮	৫.৪৯
২০০৮-২০০৯	৪.৪৪
২০০৯-২০১০	৩.৭৯

Source: Export has been complied from http. bfidexpo.com/furniture association.php (Accessed is on May 2012)

কাঠ ও কাঠসংক্রান্ত পণ্য, কাঠ কয়লা, কাঠের ছিপি, খড় প্রস্তুতকারক, বেত-জাতীয় উপাদান, ঝুড়ি, চিনামাটির পাত্র, কুঞ্চি-জাতীয় দ্রব্য থেকে ২০০২-২০০৩ সালে আয় ১,০৭,৩৬,০০০/- এবং ২০০৩-২০০৪ সালে আয় ১,৯৬,৩৮,০০০/- (সূত্রঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক)।

বাংলাদেশের ফার্নিচার প্রতিষ্ঠানগুলো কী পরিমাণ পণ্য বিক্রি করে সঠিক তথ্য সরকারকে দিতে আগ্রহী নয় বলে মনে করেন BFLOA । আর মূলত এ কারণেই বাংলাদেশ সরকার কাঠশিল্প-সম্পর্কিত কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারছে না। বাংলাদেশে ফার্নিচার শিল্পে কারখানা তৈরির জন্য অনুমোদিত স্থান হিসেবে কাঁচপুরে ২০ একর জায়গা দেওয়া হলেও তা সংস্থার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। তবে বর্তমানে ফরিদপুরে আরো একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে যেটি কাঁচপুরের তুলনায় অনেক বিশাল। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে ফার্নিচার পণ্যগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করার কোনো নিয়মনীতি নেই।

আশার কথা যে, বাংলাদেশের ফার্নিচার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম আফতাব-আখতার ফার্নিচার একাডেমি ২০১২ জানুয়ারি থেকে ফার্নিচারের ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। যেমন– ফার্নিচার তৈরিকরণ, বাজারজাতকরণ ও সাধারণ দক্ষতা সৃষ্টি প্রভৃতি। এছাড়া কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ২১ ও ২২ মার্চ ২০১২ দুই দিনব্যাপী ঢাকার ফরিদাবাদ এ এড ওয়ারিং টেকনোলজি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই ওয়ার্কশপে কাঠশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ফরিদাবাদ ও সূত্রাপুর এলাকার শ্রমিক ও মালিকদের। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো ঢাকারও বেশির ভাগ ফার্নিচার ও দরজার মূল উৎসাহ ফরিদাবাদ ও সূত্রাপুর এলাকায় দুইশরও বেশি কাঠের প্রতিষ্ঠান। তবে কাঠশিল্প নিয়ে কাজ করা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে– Kann Corporation, Wood Tech Solution, Barger Paints Bangladesh, Alteco Group.

কাঠশিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার অন্যতম কারণগুলো হলো– কাঠের ময়লা, কাঠের রস ও তৈল, শৈবাল ও ছত্রাক, রাসায়নিক উপাদান, বিষাক্ত দ্রবণ, কোলাহল, ভাইব্রেশন । এই সকল স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে কাঠশিল্প-শ্রমিকেরা যে সকল রোগ বা সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে সেগুলো হলো– চর্মরোগ বা চামড়া খসখসে হওয়া, এলার্জি, বিষাক্ত কাঠ থেকে ক্ষতিকর রোগ, কাঁপুনি রোগ, কানের সমস্যা, আগুনে পোড়া প্রভৃতি । চিকিৎসাবিজ্ঞানে লাল কালারকে ক্যানসারের সাথে তুলনা করা হয়েছে ।

প্রতি ১৪০০ শ্রমিক থেকে ১ জন এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে । ৪০ বছর ধরে গবেষণায় এই তথ্য পাওয়া গেছে। (ওয়ালার, ড. জুলিয়ান এ)

৩০ বছর ধরে কাঠশ্রমিকের পেশায় নিয়োজিত একজন শ্রমিক শ্বাসকষ্ট, হাত ও হাঁটুর সমস্যায় আক্রান্ত হন। এছাড়া অনেকের নখের সমস্যাও দেখা যেতে পারে। (উৎসঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জরিপ)

গবেষণার উদ্দেশ্য

সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহঃ কাঠশিল্প-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তথ্য উদ্‌ঘাটন করা।
বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহঃ

- কাঠশিল্প-শ্রমিকদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জানা।
- কাঠশিল্প-শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান।
- শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে জানা।
- শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সম্পর্কে জানা।

শ্রমিদের বর্তমান মজুরি ও সরকার ঘোষিত মজুরির মধ্যে সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া।

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।
গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ : গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসেবে কেস স্টাডি ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হবে।

গবেষণার সামগ্রিক ও একক– মিরপুরর, বাড্ডা, সূত্রাপুর ও গেন্ডারিয়া এলাকায় কর্মরত সকল কাঠশিল্প-শ্রমিকদের গবেষণার সামগ্রিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ডিজাইনিং, বার্নিশ, স-মিল ও আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক এ চারটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি থেকে দুইটি করে প্রত্যেকে (২x৪)=৮টি, এভাবে ৪ জনে মোট ৩২টি কেস স্টাডি পরিচালনার জন্য নির্বাচিত এলাকা হতে ৩২ জন শ্রমিককে একক হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই একটি অনুসূচি তৈরি করে তথ্য সংগ্রহের কার্য চালানো হবে।

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ : সংগৃহীত তথ্যসমূহ উদ্দেশ্যের আলোকে সাজানো এবং বর্ণনা করা হবে।

গবেষণার কর্মপরিধি

- ❖ **জীবনযাত্রার মানঃ** শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৈবাহিক অবস্থা, পরিবারের ধরন, পরিবারের সদস্যসংখ্যা, পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যসংখ্যা, দৈনিক বা মাসিক মজুরি, মাসিক আয়-ব্যয়, চাহিদাপূরণ প্রভৃতি।
- ❖ **শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ :** কর্মঘণ্টা, কর্মবিরতি, মজুরি, বোনাস, ইলেকট্রিক অবস্থা, বিশুদ্ধ খাবার ও পানি, প্রথমিক চিকিৎসা সহায়তা, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব, নিরাপত্তা সহায়তা।
- ❖ **শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা :** দুর্ঘটনা, বিশেষ রোগ-ব্যাধি, বিশেষ রোগ-ব্যাধির কারণ, অসুস্থতাকালীন সহায়তার ধরন, চিকিৎসা-সেবার পর্যাপ্ততা, চিকিৎসার খরচ বহন।

গবেষণার সময়: নভেম্বর ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪

কার্যক্রম	২৬-৩০ নভেম্বর ২০১৩	০১-০৭ ডিসেম্বর ২০১৩	০৮-১৫ ডিসেম্বর ২০১৩	১৬-৩০ ডিসেম্বর ২০১৩	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
সাহিত্য সমীক্ষা					
প্রশ্নপত্র তৈরি					
প্রশ্নপত্রের যথার্থতা যাচাই					
প্রশ্নপত্র ছড়ান্ত					
তথ্য সংগ্রহ					
তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ					
রিপোর্ট তৈরি (খসড়া)					
রিপোর্ট ছড়ান্তকরণ					
রিপোর্ট প্রকাশ					

কাঠশিল্প-শ্রমিকদের ওপর পরিচালিত কেস স্টাডি

কেস স্টাডি-১

মো. চান মিয়া

বয়স : ৬০ বছর

কর্মরত প্রতিষ্ঠান : বাড্ডা টিম্বার ট্রেডার্স

জেলা : পিরোজপুর

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা

মো. চান মিয়ার পৈত্রিক বাড়ি পিরোজপুর জেলায়। তিনি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬ সদস্যের একটি যৌথ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। দারিদ্র্যের কারণে তিনি বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি। তিনি জীবিকার তাগিদে পিরোজপুর থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি বর্তমানে বাড্ডা টিম্বার ট্রেডার্স স-মিল নামের একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ এই কারখানায় বাস করেন। তার পরিবারের অন্যান্য ৫ জন সদস্য তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তিনি মোট মাসিক বেতন পান ১২,০০০/- টাকা। তিনি খাওয়া বাবদ প্রতি মাসে ৩,০০০/- টাকা, চিকিৎসা বাবদ ৫০০-১,০০০/- টাকা, শিক্ষা বাবদ ৫০০-৭০০/- টাকা খরচ করেন। বিনোদনের জন্য তিনি কোনো টাকা খরচ করেন

না। তিনি এই পেশায় আসার আগে অন্য কোনো পেশায় যুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজের ইচ্ছায় এই পেশায় আসেন। তিনি এই পেশায় ২৪ বছর ধরে যুক্ত আছেন। তিনি তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যকে এই পেশায় যুক্ত করতে চান না।

কর্মপরিবেশ-সম্পর্কিত তথ্য

শ্রমিক মো. চান মিয়া বাড্ডা টিম্বার ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানে কাঠ চেরাই করার স-মিলে হেড মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র ছাড়া কাজ করেন। প্রতিদিন তিনি এই প্রতিষ্ঠানে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত কাজ করেন। তিনি প্রতিদিন এখানে ১২ ঘণ্টা কাজ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করেন। এখানে প্রতি শুক্রবার ছুটি থাকে। দুপুরের খাওয়ার বিরতি হিসাবে ১ ঘণ্টা কাজ বন্ধ থাকে, দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত। প্রতিবছরে দুই ঈদের সময় প্রতিষ্ঠান থেকে বোনাস দেওয়া হয়। রোজার ঈদের সময় মূল বেতনের সমান বোনাস দেওয়া হয়। আর কুরবানি ঈদের সময় মূল বেতনের অর্ধেক বোনাস দেওয়া হয়। তার মূল বেতন হলো ৮,০০০/- টাকা, ওভার টাইম দিয়ে ১২,০০০/- টাকার মতো পায়। প্রতিষ্ঠানে ওয়াসার পানির লাইনের পানি থাকলেও বিশুদ্ধ পানি শ্রমিকেরা কিনে খায়। প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের খাবার ব্যবস্থা করা হয় না। নিজেরা বাজার করেন এবং নিজেরা রান্না করেন। এখানে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো। কারখানায় পরিবেশের যে অবস্থা তা খুব ভালো নয়।

শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা

কাঠশিল্প-শ্রমিকদের ঝুঁকি মূলত কাঠ চেরাই করার করাত অনেক সময় করাত ছিঁড়ে যায়। তখন শ্রমিকের অঙ্গহানি ঘটে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। স-মিলে শ্রমিকদের মূলত স্বাস্থ্যগত সমস্যা হলো কোমরে ব্যথা, ফুসফুসে সমস্যা, কাশি, মাঝে মাঝে কাঠের ধুলা-বালি প্রচণ্ড ভোগায়। মাস্ক পরে তারা বেশি সময় থাকতে পারে না। কারণ তাদের সমস্যা হয়, বারবার খুলতে হয়। কারখানায় কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হলে মালিকপক্ষ বেতনসহ ছুটি দেয়। অন্য কোনো কারণে অসুস্থ হলে চিকিৎসা বাবদ নিজের অর্থ জোগান নিজেরই করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পেশার স্থায়িত্ব মালিক এবং শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কারণ মালিকপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করার জন্য ১ মাস আগে বলে দেয় এবং শ্রমিক তার ইচ্ছামতো অর্থাৎ মালিকপক্ষকে ১ মাস আগে জানিয়ে দেয়।

বর্তমান মজুরি ও সরকার ঘোষিত মজুরি ও সুযোগ-সুবিধাসংক্রান্ত তথ্য

সরকার ঘোষিত মজুরিকাঠামো সম্পর্কে মো. চান মিয়ার কোনো ধারণা নেই। তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার মালিক সময়মতো টাকা দেন না। দৈনিক ১৪ ঘণ্টা কাজের তুলনায় বেতন অনেক কম। কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় আহত হলে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় না। মালিকপক্ষ সব সময় শ্রমিকদের শোষণ করে, মজুরি কম দিতে চায়, বেতন বাড়াতে চায় না। শ্রমিক অধিকার সম্পর্কে মো. মিয়ার কোনো জ্ঞান নেই। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত মজুরিকাঠামো

অনুযায়ী শহর অঞ্চলে একজন কাঠমিস্ত্রি সর্বমোট মজুরি ১৫,৫৮৫/- টাকা মাসিক এবং দৈনিক হিসেবে ৬০০/- টাকা পান। পক্ষান্তরে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে মাসিক ১৪,৩৭০/- টাকা এবং দৈনিক ৫৫০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ২০১২ সালে কাঠশিল্প-শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ৩৭৫/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, সরকার ঘোষিত মজুরি ও বর্তমান স-মিলে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শ্রম আইনে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার কথা বলা হয়েছে। তবে সেটি কার্যকর হচ্ছে না। এখন বলা যায়, শ্রমিকদের সকল চাহিদা পূরণ হচ্ছে সাধারণ নিয়ম অনুসারে, আইন অনুযায়ী নয়।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

কারখানার মালিকদের সাথে শ্রমিকদের মৌখিকভাবে সম্পর্ক ভালো, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। মালিকপক্ষ ঠিকঠাক বেতন দেয় না, কাজে ভুল করলে রাগারাগি করে, বেতন বৃদ্ধিতে অনীহা রয়েছে। তার মতে, মালিকের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে। তিনি স-মিল ইউনিয়নের সাথে জড়িত নন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানো এবং নিজেকে ধর্মীয় কাজের সাথে জড়িত রাখা।

সরকার এবং মালিক শ্রেণির প্রতি সুপারিশসমূহ

১. শ্রমিকদের সময়মতো মজুরি বৃদ্ধি করা।
২. সরকার ঘোষিত ছুটির ব্যবস্থা করা।
৩. নিরাপদ কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা করা।
৪. নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
৫. নিয়োগপত্রের ব্যবস্থা করা।
৬. বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করা।

কেস স্টাডি-২

মো. মিজানুর রহমান

বয়স	:	৩৩ বছর
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	:	সায়েম ফার্নিচার
জেলা	:	রংপুর

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা:

মো. মিজানুর রহমানের পৈত্রিক বাড়ি রংপুর জেলায়। তিনি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৪ সদস্যের একটি যৌথ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তিনি জীবিকার তাগিদে রংপুর থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি বর্তমানে ঢাকার ডি.আই.টি প্লট, গেন্ডারিয়া, ঢাকা এলাকায় বসবাস করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে একজন আসবাবপত্র তৈরিকারক হিসেবে কাজ করেন। তার পরিবারের অন্য ৩ জন সদস্য তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তিনি মোট মাসিক বেতন পান ১২,০০০/- টাকা। তিনি প্রতি মাসে বাড়িভাড়া বাবদ ৩,০০০/- টাকা, তিনি খাওয়া বাবদ প্রতি মাসে ৪,৫০০-

৫,০০০/- টাকা, শিক্ষা বাবদ ৫০০-১,০০০/- টাকা খরচ করেন। বিনোদনের জন্য তিনি ৩০০-৫০০/- টাকা খরচ করেন। তিনি এই পেশায় আসার আগে অন্য কোনো পেশায় যুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজের ইচ্ছায় এই পেশায় আসেন। তিনি এই পেশায় ১৪ বছর ধরে যুক্ত আছেন। তিনি তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যকে এই পেশায় যুক্ত করতে চান না।

কর্মপরিবেশ-সম্পর্কিত তথ্য

শ্রমিক মো. রহমান সায়েম ফার্নিচার নামের একটি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র তৈরিকারক হিসেবে কাজ করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র ছাড়া কাজ করেন। প্রতিদিন তিনি এই প্রতিষ্ঠানে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করেন। তিনি প্রতিদিন এখানে ১৪ ঘণ্টা কাজ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করেন। এখানে প্রতি শুক্রবার ছুটি থাকে। দুপুরের খাওয়ার বিরতি হিসাবে ১ ঘণ্টা কাজ বন্ধ থাকে, দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। প্রতিবছরে দুই ঈদের সময় প্রতিষ্ঠান থেকে বোনাস দেওয়া হয় না। রোজার ঈদ ও কুরবানি ঈদের সময় মূল বেতনের সাথে মালিক খুশি হয়ে ৫০০-১,০০০/- টাকা দেন। তার মূল বেতন হলো ৮,০০০/- টাকা, ওভার টাইম দিয়ে ১২,০০০/- টাকার মতো পান। প্রতিষ্ঠানে ওয়াসার পানির লাইনের পানি থাকলেও বিশুদ্ধ পানি শ্রমিকেরা কিনে খায়। প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের খাবার ব্যবস্থা করা হয় না। নিজেরা বাজার করেন এবং নিজেরা রান্না করেন। এখানে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো। কারখানায় পরিবেশের যে অবস্থা তা খুব ভালো নয়।

শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা

কাঠশিল্প-শ্রমিকদের ঝুঁকি মূলত স্বাস্থ্যগত সমস্যা হলো : কোমরে ব্যথা, ফুসফুসে সমস্যা, কাশি, মাঝে মাঝে কাঠের ধুলা-বালি প্রচণ্ড ভোগায়। মাস্ক পরে তারা বেশি সময় থাকতে পারে না কারণ তাদের সমস্যা হয় বারবার খুলতে। কারখানায় কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হলে মালিকপক্ষ বেতনসহ ছুটি দেয় না। অন্য কোনো কারণে অসুস্থ হলে চিকিৎসা বাবদ নিজের অর্থ জোগান নিজেরই করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পেশার স্থায়িত্ব মালিক এবং শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কারণ মালিকপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করার জন্য ১ মাস আগে বলে দেয় এবং শ্রমিক তার ইচ্ছামতো অর্থাৎ মালিকপক্ষকে ১ মাস আগে জানিয়ে দেয়।

বর্তমান মজুরি ও সরকার ঘোষিত মজুরি ও সুযোগ-সুবিধাসংক্রান্ত তথ্য

সরকার ঘোষিত মজুরিকাঠামো সম্পর্কে মো. মিজানুর রহমানের কোনো ধারণা নেই। তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার মালিক সময়মতো টাকা দেন। দৈনিক ১৪ ঘণ্টা কাজের তুলনায় বেতন অনেক কম। কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় আহত হলে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় না। মালিকপক্ষ সব সময় শ্রমিকদের শোষণ করে, মজুরি কম দিতে চায়, বেতন বাড়াতে চায় না। শ্রমিক অধিকার সম্পর্কে রহমানের কোনো জ্ঞান নেই। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত মজুরি কাঠামো অনুযায়ী শহর অঞ্চলে একজন কাঠমিস্ত্রি সর্বমোট মজুরি ১৫,৫৮৫/- টাকা মাসিক এবং

দৈনিক হিসেবে ৬০০/- টাকা পান। পক্ষান্তরে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে মাসিক ১৪,৩৭০/- টাকা এবং দৈনিক ৫৫০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ২০১২ সালে কাঠশিল্প-শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ৩৭৫/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, সরকার ঘোষিত মজুরি ও বর্তমান আসবাবপত্র তৈরিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শ্রম আইনে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার কথা বলা হয়েছে। তবে সেটি কার্যকর হচ্ছে না। এখন বলা যায়, শ্রমিকদের সকল চাহিদা পূরণ হচ্ছে সাধারণ নিয়ম অনুসারে, আইন অনুযায়ী নয়।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

কারখানার মালিকদের সাথে শ্রমিকদের মৌখিকভাবে সম্পর্ক ভালো, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। মালিকপক্ষ ঠিকঠাক বেতন দেয় না, কাজে ভুল করলে রাগারাগি করে, বেতন বৃদ্ধিতে অনীহা রয়েছে। তার মতে, মালিকের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে। তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত নন। ভবিষ্যত পরিকল্পনা বলতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানো এবং নিজেকে ধর্মীয় কাজের সাথে জড়িত রাখা।

সরকার এবং মালিক শ্রেণির প্রতি সুপারিশসমূহ

১. শ্রমিকদের সময়মতো মজুরি বৃদ্ধি করা।
২. সরকার ঘোষিত ছুটির ব্যবস্থা করা।
৩. নিরাপদ কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা করা।
৪. নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
৫. নিয়োগপত্রের ব্যবস্থা করা।
৬. বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করা।

কেস স্টাডি-২

মো. মিলন মিয়া

বয়স	:	২২ বছর
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	:	আইডিয়াল ফার্নিচার
জেলা	:	গোপালগঞ্জ

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা

মো. মিলন মিয়ার পৈত্রিক বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলায়। তিনি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ সদস্যের একটি যৌথ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তিনি জীবিকার তাগিদে গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি বর্তমানে ঢাকার পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা এলাকায় বসবাস করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে একজন আসবাবপত্র তৈরিকারক হিসেবে কাজ করেন। তার পরিবারের অন্য ৫ জন সদস্য তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তিনি মোট মাসিক বেতন পান ১২,০০০/- টাকা।

তিনি প্রতি মাসে বাড়িভাড়া বাবদ ৫,০০০/- টাকা, তিনি খাওয়া বাবদ প্রতি মাসে ২,০০০/- টাকা, শিক্ষা বাবদ কোনো খরচ করেন না। বিনোদনের জন্য তিনি ৩০০-৫০০/- টাকা খরচ করেন। তিনি এই পেশায় আসার আগে অন্য কোনো পেশায় যুক্ত ছিলেন না। তিনি ভাইদের পরিচয়ে এই পেশায় আসেন। তিনি এই পেশায় ১২ বছর ধরে যুক্ত আছেন। তিনি তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যকে এই পেশায় যুক্ত করতে চান না।

কর্মপরিবেশ-সম্পর্কিত তথ্য

শ্রমিক মো. মিলন মিয়া আইডিয়াল ফার্নিচার নামের একটি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র তৈরিকারক হিসেবে কাজ করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র ছাড়া কাজ করেন। প্রতিদিন তিনি এই প্রতিষ্ঠানে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করেন। তিনি প্রতিদিন এখানে ১৬ ঘণ্টা কাজ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ৭ দিন কাজ করেন। এখানে প্রতি শুক্রবার ছুটি থাকে না। দুপুরের খাওয়ার বিরতি হিসাবে ১ ঘণ্টা কাজ বন্ধ থাকে, দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। প্রতিবছরে দুই ঈদের সময় প্রতিষ্ঠান থেকে বোনাস দেওয়া হয় না। রোজার ঈদ ও কুরবানি ঈদের সময় মূল বেতনের সাথে মালিক খুশি হয়ে ৫০০-১,০০০/- টাকা দেন। তার মূল বেতন হলো ৮,০০০/- টাকা, ওভার টাইম দিয়ে ১২,০০০/- টাকার মতো পান। প্রতিষ্ঠানে ওয়াসার পানির লাইনের পানি থাকলেও বিশুদ্ধ পানি শ্রমিকেরা কিনে খায়। প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের খাবার ব্যবস্থা করা হয় না। নিজেরা বাজার করেন এবং নিজেরা রান্না করেন। এখানে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো। কারখানায় পরিবেশের যে অবস্থা তা খুব ভালো নয়।

শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা

কাঠশিল্প-শ্রমিকদের ঝুঁকি মূলত স্বাস্থ্যগত : সমস্যা হলো কোমরে ব্যথা, ফুসফুসে সমস্যা, কাশি, মাঝে মাঝে কাঠের ধুলা-বালি প্রচণ্ড ভোগায়। মাস্ক পরে তারা বেশি সময় থাকতে পারে না, কারণ তাদের সমস্যা হয় বারবার খুলতে। কারখানায় কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হলে মালিকপক্ষ বেতনসহ ছুটি দেয় না। অন্য কোনো কারণে অসুস্থ হলে চিকিৎসা বাবদ নিজের অর্থ যোগান নিজেরই করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পেশার স্থায়িত্ব মালিক এবং শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কারণ মালিকপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করার জন্য ১ মাস আগে বলে দেয় এবং শ্রমিক তার ইচ্ছামতো অর্থাৎ মালিকপক্ষকে ১ মাস আগে জানিয়ে দেয়।

বর্তমান মজুরি ও সরকার ঘোষিত মজুরি ও সুযোগ-সুবিধাসংক্রান্ত তথ্য

সরকার ঘোষিত মজুরিকাঠামো সম্পর্কে মো. মিয়ার কোনো ধারণা নেই। তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার মালিক সময়মতো টাকা দেন। দৈনিক ১৬ ঘণ্টা কাজের তুলনায় বেতন অনেক কম। কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় আহত হলে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় না। মালিকপক্ষ সব সময় শ্রমিকদের শোষণ করে, মজুরি কম দিতে চায়, বেতন বাড়াতে চায় না। শ্রমিক অধিকার সম্পর্কে মো. মিয়ার কোনো জ্ঞান নেই। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত মজুরিকাঠামো অনুযায়ী শহর অঞ্চলে

একজন কাঠমিস্ত্রি সর্বমোট মজুরি ১৫,৫৮৫/- টাকা মাসিক এবং দৈনিক হিসেবে ৬০০/- টাকা পান। পক্ষান্তরে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে মাসিক ১৪,৩৭০/- টাকা এবং দৈনিক ৫৫০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ২০১২ সালে কাঠশিল্প-শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ৩৭৫/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, সরকার ঘোষিত মজুরি ও বর্তমান আসবাবপত্র তৈরিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শ্রম আইনে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার কথা বলা হয়েছে। তবে সেটি কার্যকর হচ্ছে না। এখন বলা যায়, শ্রমিকদের সকল চাহিদা পূরণ হচ্ছে সাধারণ নিয়ম অনুসারে, আইন অনুযায়ী নয়।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

কারখানার মালিকদের সাথে শ্রমিকদের মৌখিকভাবে সম্পর্ক ভালো, তবে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। মালিকপক্ষ ঠিকঠাক বেতন দেয় না, কাজে ভুল করলে রাগারাগি করে, বেতন বৃদ্ধিতে অনীহা রয়েছে। তার মতে মালিকের সাথে ভালো সম্পর্ক নেই। তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত নন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে ২০১৮ সালে বিয়ে করা এবং পরবর্তীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানো এবং নিজেকে ধর্মীয় কাজের সাথে জড়িত রাখা।

সরকার এবং মালিক শ্রেণির প্রতি সুপারিশসমূহ

১. শ্রমিকদের সময়মতো মজুরি বৃদ্ধি করা।
২. সরকার ঘোষিত ছুটির ব্যবস্থা করা।
৩. নিরাপদ কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা করা।
৪. নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
৫. নিয়োগপত্রের ব্যবস্থা করা।
৬. বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করা।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শ্রম অধিকার, সচেতনতা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অবস্থা : একটি নমুনা জরিপ

–কানিজ ফাতেমা খান

ভূমিকা

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম শহর এবং দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্রধান শহর। এটি পৃথিবীর প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে একটি। ১৬১০ সালে মোগল আমলে ঢাকা শহরের নাম করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ঢাকা শহর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঢাকা শহরকে বসবাস উপযোগী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা হয় ১ আগস্ট ১৮৬৪ সালে। তখন এটির নাম ছিল ঢাকা পৌর প্রতিষ্ঠান। ''ঢাকা শহরের আয়তন ৩৬০ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩.৪৮%, জনসংখ্যার অনুপাত পুরুষ : নারী = ১১৯ : ১০০, সাক্ষরতার হার ৭২.৭% (Dhaka Bangladesh Map: 2010)

২০১১ সালের ২৯ নভেম্বর স্থানীয় সরকারের অধীনে একটি সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ''ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (এপ্রিল, ২০১১) ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (১ আগস্ট, ১৮৬৪)'' নামে দুইটি সিটি কর্পোরেশনে ভাগ করা হয়। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে আর এই বিরাট জনসংখ্যা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য সৃষ্টি করছে এবং যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা শহরের দুইটি সিটি কর্পোরেশন, যার মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫২১৩ পরিচ্ছন্নতাকর্মী। কিন্তু যারা প্রতিদিনই বর্জ্য ব্যবস্থপনার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বসবাস উপযোগী রাখার চেষ্টা করছে। তাদের জীবনযাত্রায় অবস্থার মান অতি নিম্নপর্যায়ের এবং প্রতিনিয়তই স্বাস্থ্যঝুঁকির ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি থেকেই যাচ্ছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে নিরাপত্তাহীনতার জন্য তাদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী পরিচ্ছন্নতা কাজের সময় বাস চাপায় মারা যায় (দ্য ডেইলি সান, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৪)।

এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সত্ত্বেও অধিকাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীই পর্যাপ্ত বেতন-বোনাসসহ পেশাগত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পায় না। ঢাকা শহরের দুইটি সিটি কর্পোরেশনেই দুই ধরনের বেতনকাঠামোর পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে। তাদের মধ্যে একধরনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে যাদের বেতন স্কেল ৭০০০ টাকা এবং অপর ধরনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী মাস্টার রোল, তারা দৈনিক ২৬৫ টাকা মুজুরিতে কাজ করে, যা ঢাকা শহরের অবস্থার প্রেক্ষিতে খুবই নগণ্য। এছাড়া অপর্যাপ্ত ছুটি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব এবং নিরাপত্তাহীনতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়গুলো তাদের ব্যক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে জানা যায়। আর এই বিষয়গুলোর কারণে অনেকেই এই পেশায়

আসতে চাচ্ছে না। দুর্বল বেতনকাঠামো স্বাস্থ্যঝুঁকি, সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং যন্ত্রপাতির অভাব এবং সামাজিকভাবে খুব একটা সম্মানজনক নয় বলে এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অনেক ক্ষেত্রে কাজের প্রতি অনীহা এবং কাজ ফাঁকি দেওয়ার কারণে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি সঠিকভাবে তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করতে চায় না। এর ফলে দেখা যায় রাস্তার ধারে, ডাস্টবিনে বা বিভিন্ন জায়গায় বর্জ্য বহুদিন যাবৎ খোলা অবস্থায় পড়ে থাকে। ফলে পরিবেশদূষণসহ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি থেকে যায়। আর এরই ফলস্বরূপ সাধারণ গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখতে পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পরামর্শ প্রতিষ্ঠান মার্সার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ প্রকাশ করে "কোয়ালিটি অব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিটি র‍্যাংকিং ২০১৪"। ৩৯টি বিষয় বিবেচনা করে জরিপ চালিয়ে বৈশ্বিক এবং অঞ্চলভিত্তিক দুটি আলাদা তালিকা প্রকাশ করে মার্সার। এতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ ২০৮। এটি এশিয়ার দ্বিতীয় নিকৃষ্টতম শহর। এছাড়া "ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ)" বিবেচনায় ঢাকা বসবাসের অযোগ্য নগরে পরিণত হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ওপর পরিচালনা করা হয়েছে। ঢাকা শহরসহ দেশের সব শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার জন্য এবং এদের জীবনযাত্রার ধরন, কাজের পরিবেশ, কাজের বিভিন্ন সরঞ্জাম, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক অবস্থা ও তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের জনগণের কাছে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এই গবেষণার মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জীবনমান, অধিকার, পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধা, কর্মের পরিবেশ, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আগমন ব্যবস্থা, খাবারের মান, বিভিন্ন সমস্যা, স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে, যা তাদের ভূমিকা পালন ও সমস্যা সমাধানে এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ঢাকা শহর থেকে শুরু করে পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত সব শহরেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ওপর। কিন্তু তাদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জামের অপ্রতুলতার ফলে তাদেরকে মারাত্মক রোগব্যাধীতে আক্রান্ত হতে হয়, যা খুবই দুঃখজনক। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই তাদের সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাদের জীবনমান উন্নয়নে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদাসীনতা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে অনেক গবেষণা পরিচালিত হলেও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিয়ে তেমন কোনো ধরনের গবেষণাই পরিচালিত হয়নি। ফলে তাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া অনেকটাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জীবনযাত্রার ধরন ও পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, অধিকার অবস্থা ও তাদের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে জানা যাবে, যার ফলে তাদের সম্পর্কে সাধারণ জনগণ জানতে পারবে ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শ্রম অধিকার সচেতনতা এবং পেশাগত স্বস্থ্য ও নিরাপত্তা অবস্থা জানা।

বিশেষ উদ্দেশ্য

১. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।
২. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা।
৩. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বস্থ্যগত ঝুঁকি তারা কী কী সমস্যায় আক্রান্ত হয় তা চিহ্নিত করা।
৪. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আয় কাঠামো ও কর্মসংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধাসমূহ জানা।
৫. পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কী ধরনের প্রতিকার পাচ্ছে বা তাদের অধিকারসমূহ কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মতামত জানা।
৬. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে তাদের পরামর্শ তুলে ধরা।

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি মূলত তথ্য অনুসন্ধানমূলক একটি নমুনা জরিপ।

গবেষণা এলাকা

এই গবেষণাটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকা যেমন– সূত্রাপুর দয়াগঞ্জ, ধলপুর ও হাজারীবাগ এলাকাকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণা সমগ্রক

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের এই গবেষণার সমগ্রক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

নমুনা ও নমুনায়ন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্যমূলকভাবে সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণা এলাকা থেকে ২০০ জনের একটি নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের কৌশল

প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নমুনা হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য উন্মুক্ত ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সমন্বয়ে একটি সাক্ষাৎকার অনুসূচি তৈরি করা হয়েছে। একই যে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, যা পূর্ব পরীক্ষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস

এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং একই সাথে মাধ্যমিক উৎসভিত্তিক যেমন– জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

সংগৃহীত তথ্য প্রথমে সম্পাদন করা হয়েছে। এর পর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তথ্যসমূহকে শ্রেণীবদ্ধকরণ ও তালিকাবদ্ধ করা হযেছে এবং বর্ণামূলক পরিসংখ্যান ধারা তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ তথ্য বিভিন্ন টেবিল, গ্রাফ এবং চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা

পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পরিচ্ছন্নতাকর্মী বলতে ঢাকা শহরের বর্জ্য ব্যবস্থপনার কাজে নিয়জিত কর্মীদের বোঝায় যারা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োজিত থাকে এবং বর্জ্যের প্রাথমিক অবস্থা থেকে সর্বশেষ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ঢাকা শহরের সমস্যা সমাধানমূলক বিভিন্ন উন্নয়নমুখী ও সৌন্দর্যবর্ধনে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান।

পেশাগত স্বাস্থ্য

পেশাগত স্বাস্থ্য বলতে কর্মস্থলে কর্মকালীন সময়ে শ্রমিকদের কাজের সাথে শরীর ও মনের যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

নিরাপত্তা

শ্রমিকদের সকল প্রকার দুর্ঘটনা, ঝুঁকি ও অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা করে তাদের কল্যাণমূলক কর্মজীবন ও জীবনযাপন সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

''ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শ্রম অধিকার, সচেতনতা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অবস্থা : একটি নমুনা জরিপ'' শীর্ষক গবেষণা কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে একজন শিক্ষানবিশ গবেষক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা ও বাধার

সম্মুখীন হয়েছি। এই সীমাবদ্ধতা এবং বাধা এসেছে কখনো নিজের দক্ষতা ও অজ্ঞতার জন্য, আবার কখনো এসেছে উত্তরদাতাদের কাছে থেকে, আবার কখনো এসেছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে। গবেষণা করতে গিয়ে আমি যে ধরনের সমস্যর সম্মুখীন হয়েছি সেগুলো তুলে ধরা হলো :

১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিয়ে পূর্বে কোনো গবেষণা না হওয়ায় এই সম্পর্কিত কোনো, বইপত্র, জার্নাল, সাময়িকীয় প্রবন্ধ পাওয়া যায়নি।
২. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে গবেষণাধীন তথ্যের উত্তর প্রদানে প্রচণ্ড ধরনের অনীহা দেখা গেছে।
৩. পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। কয়েকজন নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের যৌন হয়রানির বিষয়টি বোঝা গেলেও তারা তা স্বীকার করতে চায় না। এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না।
৪. কিছু প্রশ্নের উত্তর তারা এড়িয়ে গেছে এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন জন বিভিন্নটি দিয়েছেন, ফলে আমাদের জন্য কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা নির্ধারণ করা কঠিন হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।
৫. চুক্তিভিত্তিক এবং দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রশ্ন করলে তারা চাকরি হারানোর ভয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হয়নি।
৬. বর্তমান গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা এলাকা থেকে স্বল্পসংখ্যক নমুনা (২০০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী) নির্বাচন করা হয়েছে। তা হয়তো বা সমগ্রকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে।
৭. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ভালো পরিবেশ আবশ্যক হলেও সর্বক্ষেত্রে এটা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। রাস্তায় কোলাহলপূর্ণ ঘিঞ্জি দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ ও বসার স্থানের অভাবে অনেক সময় তথ্য সংগ্রহে সমস্যা হয়েছে।
৮. শিক্ষানবিশ গবেষক হিসেবে গবেষণাটি হাতেখড়ি বিধায় এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় ও যথাযথ উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছুটা ভুল ত্রুটি থেকে যেতে পারে। তাছাড়া সাক্ষাৎকার অনুসূচি প্রণয়ন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণে কিছুটা ভুলত্রুটি ও অসংগতি থাকতে পারে।
৯. সর্বোপরি সময়ের স্বল্পতার কারণে পর্যাপ্ত সাহিত্য পর্যালোচনা সম্ভব হয়নি এবং স্বল্প সময়ে প্রতিবেদন উপস্থাপনের কারণে মুদ্রণজনিত ও ভাষাগত ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল বা যথাযথ হয়েছে, এটা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ এ ধরনের গবেষণাতে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় বা চলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গবেষণার ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই গবেষণাকর্মটি সঠিকভাবে সম্পাদন করার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সীমাবদ্ধতা গবেষণা কর্মটি পরিচালনার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, যা আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না।

লিটারেচার রিভিউ

গবেষণা একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধিৎসু প্রক্রিয়া। এটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সৃষ্টির একটি স্বীকৃত ও অনবদ্য পন্থা যা অপেক্ষাকৃত উদ্দেশ্যভিত্তিক। পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন বিষয়ে জানতে চেষ্টা করে বা পুরনো জ্ঞাত বিষয়কে যাচাই করে এবং এদের মধ্যকার পারস্পরিক ব্যবধান ঘোচাতে সহায়তা করে। গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। সাহিত্য হলো প্রচোলিত জ্ঞানভান্ডার আর তাই লিটারেচার রিভিউ-এর মাধ্যমে একদিকে গবেষণাসংশ্লিষ্ট প্রচলিত জ্ঞান কোন স্তরে আছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হয় এবং অন্যদিকে গবেষণাকর্মের সার্বিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। তাই যেকোনো সামাজিক গবেষণার জন্য গবেষণা বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বই-পত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, জার্নাল প্রভৃতির পর্যালোচনা অতীব জরুরি।

গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা গুরুত্ব উল্লেখ করে walter R.dorg তার "educational" Research: An Introduction æগ্রন্থে বলেছেন, The review of literature involve locating, reading and evaluating report of research as well as report of causl observation and that are related to the individual planned research project" (w,r,borg : 1963, 112).

লিটারেচার রিভিউ একজন গবেষককে গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুগভীর ধারণা ও প্রজ্ঞা দান করে, ফলে গবেষণাকর্ম সুচারুরুপে সম্পাদন করতে গবেষক সক্ষম হন। লিটারেচার রিভিউ গবেষণার পুনরাবৃত্তি, যথাযথ প্রশ্ন তৈরিকরণে, গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণে, হাইপোথিসিস গঠনে, উদ্দেশ্য, সময়সংকট ও শ্রমের অপচয় রোধে এবং গবেষণার সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্যে করে। মূলত ঢাকা শহরের বিভিন্ন সমস্যার ওপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষণাকার্য পরিচালিত হলেও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মীদের শ্রম অধিকার, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়নি। তাই বর্তমান গবেষণাকার্য পরিচালনার স্বার্থে ও সুবিধার্থে সীমিত সময়ের মধ্যে আমার চেষ্টা ও সামর্থ অনুযায়ী গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর নবম জনবহুল শহর এবং ১২তম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ২০১০-১০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের নগর অঞ্চলসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ (UN Date:2012)। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহরের তালিকায় ১১তম স্থানটি দখল করেছে ঢাকা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত UNFPA-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ''ঢাকা পৃথিবীর অধিকাংশ দূষিত ও অপরিষ্কার শহরগুলোর মধ্যে একটি এবং দূষিত এবং অপরিষ্কার হওয়ার পেছনে সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে" (en.wikipedia.org)।

ঢাকা মেগাসিটিটি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এর আয়তন ৩৬০ বর্গকিলোমিটার। এটি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭২৯০ জন।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ফেলার জন্য কনটেইনার বিন এবং ডাস্টবিন রয়েছে এসব কনটেইনার এবং ডাস্টবিন থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের

৫২১৩ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়জিত রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫৫৫ জন রয়েছে ট্রাক কুলি। তাদের দৈনিক বেতন রয়েছে ২৭৫ টাকা। সুইপার রয়েছে ৪৬৫৮ জন। সাধারণ রোড পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দৈনিক বেতন রয়েছে ২৬৫ টাকা। স্কেলভুক্ত রয়েছে ১৭৮৮ জন। বাকি ৩৪২৫ জন রয়েছে দৈনিক ভিত্তিতে। তারা দৈনিক আট ঘণ্টা পরিশ্রম করে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ১৯৬৪ সালের ১ আগস্ট এটি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি নামে নগর উন্নয়ন ও নগরের জনগণের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে এটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরিণত হয়। ২০১১ সালের ১৯ নভেম্বর স্থানীয় সরকারের অধীনে একটি সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ''ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন'' নামে দুটি সিটি কর্পোরেশনে ভাগ করা হয়।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের। তাদের একধরনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের চাকুরি স্থায়ী। তারা সাত হাজার টাকা স্কলে বেতন পান এবং উন্নত মানের পরিচ্ছন্নতাকর্মী যারা টেন্ডারের মাধ্যমে নিয়োগকৃত এবং কিছু পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন যারা ২৬৫ টাকা দৈনিক মজুরিতে কাজ করে থাকেন। তাদের এই বেতন জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে খুবই অপর্যাপ্ত। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে বেতন ব্যতীত তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা যেমন– বোনাস, সাপ্তাহিক ছুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ কোনো সুযোগ-সুবিধাই পায় না। এছাড়া প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে, নিরাপত্তহীনতা, স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রভৃতি সমস্যা রয়েছে। অপর্যাপ্ত বেতনের ফলে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রায় সময়ই অবসর সময়েও বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয় যা অস্বাস্থ্যকর এবং তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে।তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ২০০৫ সালে ১৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭২ বর্গ কিলোমিটারের ১৩টি ১০তলা ভবন তৈরির অনুমোদন দেয়। ECNECএর আওতায় ঢাকায় ৫টি ভবন তৈরির কথা থাকলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি এবং একটি ভবন তৈরি করতে না করতেই ধসে পড়ে (বিডি নিউজ: ২০১৩)। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উন্নয়নে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এজেন্সি (জাইকা) বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বিতভাবে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করেছে। জাপান সরকার ঢাকা শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১০০টি গোলাপি রংঙের ডিমাউন্টেবল ট্রাকসহ বিভিন্ন রকম উপকরণ সরবরাহ করেছে এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জীবনমান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও কর্মসূচি প্রদান করেছে (waste concern:2011) JICA ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিশাল পরিমাণ বর্জ্য অপসারণের জন্য অপর্যাপ্ত জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দক্ষ পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের ব্যাপারে ঢাকা সিটি কপোরেশনকে পরামর্শ প্রদান করেছেন।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন ও তথ্য বিশ্লেষণ

সারণি-৪.১ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বয়সসংক্রান্ত তথ্যাবলি

বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
২০-৩০	৩৪	১৭
৩০-৪০	৪৮	২৪
৪০-৫০	৫৫	২৭.৫
৫০-৬০	৩২	১৬
৬০-৭০	২৩	১১.৫
৭০-৮০	৮	৪
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বয়সসংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি

থেকে দেখা যায় যে, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের গড় বয়স ৪৮.৪৩ বছর। ২৭.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বয়স ৪০-৫০ বছরের মধ্যে। অপর দিকে ১৭.১৪ শতাংশপরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে। ২৪ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বয়স ৩০-৪০ বছরের মধ্যে, যা মোট পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে এক চর্তুথাংশ। আবার ১৬ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বয়স ৫০-৬০ বছরের মধ্যে, এটি ও মোট পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের এক চর্তুথাংশ। অন্যদিকে ১১.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বয়স ৬০-৭০ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ৪% পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বয়স ৭০-৮০ বছর।

সারণি : ৪.২ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বয়স সংক্রান্ত তথ্যাবলি

জেন্ডার	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
পুরুষ	১২৫	৬০.৫
মহিলা	৭৫	৩৭.৫
মোট	N = ২০০	১০০

জেন্ডারসংক্রান্ত দেয়া সারণি থেকে দেখা যায় যে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে ৬০.৫ শতাংশ পুরুষ যা মোট পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অর্ধেকের কম। অন্য দিকে মহিলা পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে ৩৭.৫ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন অর্থ উপার্জনকারী পেশার ন্যায় এ পেশাতেও নারীর অংশগ্রহণের হার রয়েছে।

সারণি : ৪.৩ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যাবলি

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
নিরক্ষর	১১১	৫৫.৫
১ম-৫ম শ্রেণি	৬২	৩১
এসএসসি	০	০
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি থেকে দেখা যায় যে, পরিচ্ছন্নতাকমীদের মধ্যে (৩১%) ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। নিরক্ষর পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে ৫৫.৫ শতাংশ। ৫ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে এই ধরনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পরিমাণ ১৩.৫ শতাংশ। ০ শতাংশকর্মী এসএসসি পাস করেন নাই। সুতরাং দেখা যায়, বেশির ভাগ পরিচ্ছন্নতাকর্মীই নিরক্ষর তারা আর কোনো লেখাপড়া করে নাই।

সারণি-৪.৪ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কর্মের ধরন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

কর্মের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
ড্রেন ক্লিন	৭৫	৩৭.৫
ট্রাক ক্লিনার	৫০	২৫
রোড ক্লিনার	৭৫	৩৭.৫
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরকর্মের ধরন সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি থেকে দেখা যায় যে, মোট ২০০ জন পরিচ্ছন্নতা কমীদের মধ্যে ৭৫জন (৩৭.৫%)ই-রোড ক্লিনার বা রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করে থাকেন। অন্যদিকে ৩৭.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীই ড্রেন ক্লিনারের কাজ করেন। ২৫ শতাংশকর্মীই ট্রাক ক্লিনারের কাজ করেন।

সারণি-৪.৫পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিয়োগসংক্রান্ত তথ্যাবলী

নিয়োগ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
স্থায়ী	৭৬	৩৮
অস্থায়ী	১২৪	৬২
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কর্ম স্থলের নির্দিষ্টতা সম্পর্কিত তথ্য হতে দেখা যায় যে, মোট ২০০ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্যে ৭৬ জনই কর্মস্থলে স্থায়ী নিয়োগের কথা বলেছেন। অর্থাৎ দেখা যায় (৩৮%) পরিচ্ছন্নতাকর্মীই কর্মস্থলে স্থায়ী নিয়োগের কথা বলেছেন। অপরদিকে (৬২%) পরিচ্ছন্নতাকর্মী কর্মস্থল অস্থায়ী নিয়োগের উত্তর দিয়েছেন।

সারণি-৪.৬ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্যাবলি

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
প্রশিক্ষন গ্রহন করেছে	০	০
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি	২০০	১০০
মোট	N = ২০০	১০০

বর্জ্য ব্যবস্থার প্রশিক্ষণসংক্রান্ত দেওয়া তথ্য হতে জানা যায় যে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সম্পূর্ণ (১০০%) প্রশিক্ষণন প্রাপ্ত নয়। অপর দিকে পরিচ্ছন্নতাকর্মী (০%) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। দেখা যাচ্ছে যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ হতে কোনো পরিচ্ছন্নতাকর্মী বর্জ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সারণি-৪.৭ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিশ্রামের/বিরতির ব্যবস্থাসংক্রান্ত তথ্যাবলি

বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে কি না	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে	৪১	২০.৫
বিশ্রামের ব্যবস্থা নাই	১৫৯	৭৯.৫
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দেওয়া তথ্য হতে জানা যায় যে, বেশির ভাগ (৭৯.৫%) পরিচ্ছন্নতাকর্মী বলেছেন তাদের কাজের মধ্যে বিশ্রাম বা বিরতির কোনো ব্যবস্থা নেই। আবার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কিছু সংখ্যককর্মী (২০.৭১%) বলেন যে তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে।

সারণি-৪.৮ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মজুরির ধরনসংক্রান্ত তথ্যাবলি

মজুরির ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
দৈনিক	২২	১১
মাসিক	১৭৮	৮৯
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মজুরির ধরনসংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর ২০০ জনের মধ্যে ১৭৮ জন মাসিক ভিত্তিতে মজুরি লাভ করে। যার শতকরা হার হচ্ছে ৮৯। অন্যদিকে দৈনিক মজুরি লাভ করে এমন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সংখ্যা হচ্ছে। মোট ২০০ জনের মধ্যে ২২ জন অর্থাৎ ১১ শতাংশ।

সারণি-৪.৯ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাসিক আয়সংক্রান্ত তথ্যাবলি

মজুরির পরিমাণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
৫০০০-৭০০০	২	১
৭০০০-৯০০০	১১২	৫৬
৯০০০-১১০০০	৪	২
১১০০০-১৩০০০	৬	৩
১৩০০০-১৫০০০	৭৬	৩৮
মোট	N = ২০০	১০০

মজুরির পরিমাণসংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি হতে আমরা দেখতে পাই যে, মোট ২০০ জন উত্তরদাতা মধ্যে ২ জনের মজুরির পরিমাণ ৫০০০-৭০০০ টাকা যা মোট পরিমাণে ১ শতাংশ। ৫৬ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মজুরির পরিমাণ ৭০০০-৯০০০ টাকার মধ্যে। অপরদিকে ২ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মজুরির পরিমাণ (৯০০০-১১০০০) টাকার মধ্যে। অপরদিকে (১১০০০-১৩০০০) টাকার মধ্যে মজুরি রয়েছে ৩ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর । এবং ৩৮ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মজুরির পরিমাণ (১৩০০০- ১৫০০০) টাকার মধ্যে।

সারণি-৪.১০ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সুযোগ-সুবিধার ধরণ	হ্যা		ইা		মোট	
	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
বোনাস	৯৮	৪৯	১০২	৫১	২০০	১০০.০০
ধর্মীয় ছুটি/বিশেষ ছুটি	০	০	২০০	১০০	২০০	১০০.০০
বিনোদনের ব্যবস্থা	0	০	২০০	১০০	২০০	১০০.০০
প্রাথমিক চিকিৎসা	৮	৪.৫	১৯১	৯৫.৫	২০০	১০০.০০

মজুরি ব্যতীত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসম্পর্কিত তথ্যর সারণি বিশ্লেষণ কতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, ২০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৮ জন অর্থাৎ ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতাই বোনাসের সুবিধা পেয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন, অর্থাৎ যা মোট উত্তরদাতার অর্ধেকের কম। ধর্মীয় ছুটি/বিশেষ ছুটির প্রশ্নে ১০০ শতাংশ উত্তরদাত ধর্মীয় ছুটি/বিশেষ ছুটি পান বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে মোট পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কেউই বিনোদনের সুবিধা পান না বলে উত্তর দিয়েছেন। খুব অল্পসংখ্যক পরিচ্ছন্নতাকর্মী ৪.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রাথমিক চিকিৎসা-সেবার কথা বলেছেন এবং বেশির ভাগ পরিচ্ছন্নতাকর্মী, অর্থাৎ ৯৫.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীই প্রাথমিক চিকিৎসা-সেবা পান না বলে উত্তর দেন।

সারণি-৪.১১ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সংগঠন	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
আছে/হ্যাঁ	১২৬	৬৩
নাই/ না	৭৪	৩৭
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সংগঠনসংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীর ২০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সংগঠন আছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে ১২৬ জন যার শতকরা হচ্ছে ৬৩। অপর দিকে সংগঠন নাই এমন উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে ৭৪ জন, যার শতকরা হার হচ্ছে ৩৭। এ তথ্য সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক কমসংখ্যক পরিচ্ছন্নতাকর্মী উত্তর দিয়েছেন সংগঠন আছে। আর অধিকাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী উত্তর দিয়েছেন সংগঠন নাই।

সারণি-৪.১২ পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না সেই সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না	**গণসংখ্যা**	**শতকরা (%)**
সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে	১২৯	৬৪.৫
সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে না	৬৫	৩২.৫
মোট	N = ২০০	১০০

বর্তমান পেশায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না এই ধরনের প্রশ্নে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ পরিচ্ছন্নতাকর্মী অর্থাৎ মোট ২০০ জনের মধ্যে ১২৯ জন, অর্থাৎ (৬৫.৫%) বলেছেন পেশার কারণে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অপর দিকে খুব অল্পসংখ্যক পরিচ্ছন্নতাকর্মী, অর্থাৎ মোট ২০০ জনের মধ্যে ৬৫ জন (৩২.৫%) পেশার কারণে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন। সুতরাং উপরউক্ত সারণি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, বেশির ভাগ পরিচ্ছন্নতাকর্মীই পেশার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

সারণি-৪.১৩ পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কর্মসংশ্লিষ্ট যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেই সংক্রান্ত তথ্যাবলি

বিভিন্ন ধরনের সমস্যা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব	৯	৪.৫
কর্মস্থলের সমস্যা	৯	২
জীবনের নিরাপত্তার অভাব	১১	৫.৫
দুর্ঘটনাজনিত সমস্যা	২৫	১২.৫
টয়লেটের সমস্যা	৪	২
যৌন হয়রানির সমস্যা	৩	১.৫
যাতায়াতের সমস্যা	৬	৩
অন্যান্য: শারীরিক অসুস্থতা, দুর্গন্ধজনিত সমস্যা, পরিশ্রম বেশি	৩০	১৫

বর্তমান পেশায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এ ধরনের প্রশ্নে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উপকরণের অভাবের কথা বলেছেন ৪.৫ শতাংশ, ২ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী কর্মস্থলের সমস্যার কথা বলেছেন । ৫.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী জীবনের নিরাপত্তাহীনতার কথা বলেছেন। এছাড়া দুর্ঘটনা জনিত সমস্যার কথা বলেছেন ১২.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী, যৌন হয়রানির সমস্যার কথা বলেছেন ১.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী। যাতায়াতের সমস্যার কথা বলেছেন ৩ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী। অন্যদিকে অন্যান্য সমস্যা যেমন:শারীরিক অসুস্থতা, দুর্গন্ধজনিত সমস্যা, পরিশ্রম বেশি এই ধরনের সমস্যার কথা বলেছেন ১৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

সারণি-৪.১৪ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থাসংক্রান্ত তথ্যাবলি

ছুটির ব্যবস্থা আছে কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
ছুটির ব্যবস্থা আছে	০	০
ছুটির ব্যবস্থা নাই	২০০	১০০
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থাসংক্রান্ত তথ্যাবলি হতে দেখা যায় যে, মোট ২০০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মধ্যে ০.০০ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা

আছে এই ধরনের তথ্য দিয়েছেন। অপরদিকে মোট পরিচ্ছন্নতাকর্মীর ১০০ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা নাই, এ ধরনের তথ্য দিয়েছেন ২০০ জন।

সারণি-৪.১৫ সিটি কর্পোরেশনের নিকট প্রত্যাশা সংক্রান্ত তথ্যাবলি

বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা	৪০	২০
বোনাসের ব্যবস্থা	৩৭	১৮.৫
বেতন বৃদ্ধি	৬৯	৩৪.৫
সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা	৪২	২১
আবাসিক	৪৭	২৩.৫
বিনোদনের ব্যবস্থা	৪	২
অন্যান্য	১৮	৯
মোট	২৫৭	১১৯.৫

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সমস্যা সমাধানে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্যাবলির সারণি হতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীই, অর্থাৎ মোট ২০০ জনের মধ্যে ৬৯ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী মনে করেন যে, তাদের বেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ২৩.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী তাদের সমস্যা সমাধানে আবাসন ব্যবস্থার কথা বলেন। অপরদিকে ২০ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী এই স্থায়ী চাকুরির কথা বলেছেন। ২১.০০ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থার কথা বলেছেন। ২ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিনোদনের সুব্যবস্থার কথা বলেছেন। এছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সমস্যা সমাধানে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলেছেন ৯ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

সারণি-৪.১৬ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসনসংকট নিরসনে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা-সংক্রান্ত তথ্যাবলি

সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা	**গণসংখ্যা**	**শতকরা (%)**
ভূমিকা নেয়	১২১	৬০.৫
ভূমিকা নেয় না	৭৯	৩৯.৫
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসন সমস্যা নিরসনে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকাসংক্রান্ত তথ্যাবলী থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসন সমস্যা নিরসনে সিটি কর্পোরেশন ভূমিকা রাখে, এই ধরনের উত্তর দিয়েছেন ৬০.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী। অপর দিকে অধিকাংশ, ৩৯.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী উত্তর দিয়েছেন পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সমস্যা নিরসনে সিটি কর্পোরেশন কোনো ভূমিকা পালন করে না।

সারণি-৪.১৭ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যাবলী

বিভিন্ন রোগ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
হাঁপানি	৯	৪.৫
অ্যাজমা	৬	৩
জ্বর	১০২	৫১
ডায়রিয়া	৩২	১৬
অন্যান্য	২০	১০
হয় না	৩১	১৫.৫
মোট	N = ২০০	১০০

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত রোগ-ব্যাধিসম্পর্কিত তথ্যাবলির সারণি বিশ্লষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বর্জ্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা প্রায় সময়ই বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সারণির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, ৪.৫ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ৩ শতাংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী অ্যাজমা সমস্যায় ভুগে থাকে, ডাইরিয়ায় আক্রন্ত হয় ১৬ শতাংশ কর্মী, ১০ শতাংশ কর্মী অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়। আর ১৫.৫ শতাংশ কর্মী উত্তর দিয়েছেন, তারা কোনো সমস্যায় আক্রান্ত হয় না।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উন্নয়নে সুপারিশমালা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫১১৩ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রতিনিয়ত ঢাকা শহরে সৃষ্ট বর্জ্য অপসারণ করে ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন ধরনের সমম্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে। ফলে অনেকেই এই পেশায় আসতে চাচ্ছে না। আবার অনেকেই এই পেশার পরিবর্তন করছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত এই সকল পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সমস্যার সমাধান ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন :

১. **বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা :** ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বেতন স্কেল ৮০০০ টাকা এবং যারা দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করে তাদের ২৬৫ টাকা, যা ঢাকা শহরে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই অনতিবিলম্বে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২. **পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা :** পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে সামান্য পরিমাণ বেতন ছাড়া তেমন কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক ছুটি প্রভৃতি পায় না। সুতরাং তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা করা উচিত।

৩. **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা :** পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি বা উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই, ফলে তারা তাদের ইচ্ছামতো কাজ করে, ফলে বিভিন্ন সময় নিজেদের ও সিটি কর্পোরেশনের অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং পরিচ্ছন্নতাকর্মী সিটি কর্পোরেশন ও নাগরিকদের কল্যাণের জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪. **প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা :** পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ পায় না বা প্রয়োজনীয় উপকরণ আনেক সময় নষ্ট হয়ে গেলে তাদের নিজেদের টাকা দিয়ে কিনতে হয়, ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হয়। সুতরাং সিটি কর্পোরেশনকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৫. **ছুটির ব্যবস্থা করা :** পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা তেমন কোনো ধরনের ছুটিই পায় না। ফলে প্রতিদিনই কাজ করার ফলে তাদের কাজের প্রতি যেমন অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সাথে তাদের কর্মদক্ষতারও উন্নয়ন ঘটছে না এবং তাদের সামাজিক সম্পর্ক ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং এই সকল কারণে তাদের ছুটির ব্যবস্থা করা প্রযোজন।

৬. **আবাসন ব্যবস্থা করা :** আবাসন সমস্যা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা । ধলপুরে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য কিছু কলোনি থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগন্য। ফলে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা অল্প টাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করে যা তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সিটি কর্পোরেশন ও সরকারকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৭. **চিকিৎসা ব্যবস্থা করা :** পেশাগত কারণে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা অনেক সময় কাটা-ছেঁড়া বা বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সিটি কর্পোরেশন থেকে তাদের রোগ-ব্যাধির জন্য কোনো ধরনের চিকিৎসা-সেবা পায় না। ফলে তাদের নিজেদেরকে চিকিৎসার খরচ বহন করতে হয়। সুতরাং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রযোজন।

৮. **নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা :** পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা আনেক ভোরে পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত থাকে, ফলে অনেক সময় তারা দুর্ঘটনার শিকার হয়। যার ফলে তারা শারীরিকভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে বা আনেক সময় মারা যায়। সুতরাং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. **টয়লেটের ব্যবস্থা করা :** পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বেশির ভাগ জনই বলেছেন যে, কর্মক্ষেত্রে তাদের কোনো টয়লেট নেই। বিশেষ করে নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য এটি খুবই অসুবিধাজনক। সুতরাং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কর্মস্থলে টয়লেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১০. **চাকুরি স্থায়ী করণ :** সিটি কর্পোরেশনে দুই ধরনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে। কিছু স্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মী আর কিছু অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মী। অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে রয়েছে কিছু দৈনিক মজুরিভিত্তিক এবং কিছু টেন্ডারের মাধ্যমে নিয়োগকৃত। এই অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই সকল অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকুরি স্থায়ীকরণ প্রয়োজন।

১১. **সংগঠনের ব্যবস্থা করা :** পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিজেদের কোনো সংগঠন থাকলেও তারা তাদের সমস্যা, দাবি প্রভৃতি যথাযথ কতৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতে পারে না এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আর এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সংগঠন অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিজেদের স্বার্থে সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১২. **আইনগত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা :** পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা তাদের পেশাগত কারণে বা অন্য কোন কারণে আইনি সমস্যায় পড়লে সিটি কর্পোরেশন বা সরকার কেউই তাদের কোনো ধরনের আইনগত সেবা প্রদান করে না। ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা ব্যহত হয়। সুতরাং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিভিন্ন ধরনের আইনগত সমস্যা সমাধানে সিটি কর্পোরেশন এবং সরকারকে আইনগত সেবা প্রদান করতে হবে।

সুতরাং অবশেষে আমরা বলতে পারি যে, উপযুক্ত সুপারিশগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শ্রম অধিকার, পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ও জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব।

কেস উপস্থাপন ও সমাজকর্মের নীতিমালার আলোকে
Vulnerability Assessment and After Award Service (for Rana Plaza Survivors and their family member)
কেস স্টাডি বিশ্লেষণ

–শারমিন আক্তার

কেস স্টাডি- ০১

সাহায্যার্থীর পরিচিতি

নাম	:	তাসলিমা আক্তার (ছদ্মনাম)
বয়স	:	৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৫ম শ্রেণি
দুর্ঘটনায় মৃতের সাথে সম্পর্ক	:	স্বামী-স্ত্রী

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য

সাহয্যপ্রার্থী রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় তার স্বামীকে হারিয়েছেন। এখন তিনি বিধবা। পরিবারে আছে তার একটি মাত্র মেয়ে। বর্তমানে সাভারেই তিনি একটি ঘর ভাড়া করে থাকেন। স্বামী এবং তিনি একই স্থানে অর্থাৎ রানা প্লাজায় কাজ করতেন। দুর্ঘটনার দিন তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও স্বামীকে হারান। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়ে ও নিজের খরচ সম্পূর্ণ নিজেকেই বহন করতে হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি দক্ষতা

তিনি মোটামুটি ভালোভাবে লিখতে ও পড়তে পারেন। তিনি সেলাইকাজ জানেন। কিন্তু এর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি।

বর্তমান কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত তথ্য ও কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

তার নিজ গৃহে সেলাইকাজ করেন এবং এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি গত ৮ মাস যাবৎ এই কাজটি করে যাচ্ছেন। তার ইচ্ছে তিনি একটি দর্জি দোকান খুলবেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান।

স্বাস্থ্যসম্পর্কিত তথ্য

এই দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও বুকে ও মাথায় আঘাত পান। এই জন্য তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ঢাকার একটি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা-পেয়েছেন। কিন্তু তিনি এখনো পুরোপুরি সুস্থ নন। অসুস্থতা নিয়েই তিনি পেট চালাতে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি প্রায়ই ক্লান্তি অনুভব করেন। দুর্ঘটনার কথা মনে করে প্রায়ই কাঁদেন, রাতে অনেক সময় ঘুম হয় না। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এ অবস্থার জন্য তিনি কখনো মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হননি। (এখানে শুধু গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হয়েছে)।

প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে পরিকল্পনা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারিয়ে এবং নিজে আহত হয়ে তিনি বেশ কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। তার কিছু অংশ দৈনন্দিন জীবন যাপনে ব্যয় করেছেন এবং বাকি অংশটুকু ব্যাংকে জমা রেখেছেন। বাকি ক্ষতিপূরণের টাকা মেয়ের ভবিষ্যৎ ও নিজের আত্মকর্মসংস্থানের কাজে লাগাতে চান।

অন্যান্য সাহায্যপ্রাপ্তি ও প্রত্যাশিত সাহায্য

আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াও তিনি চিকিৎসা-সেবা পেয়েছেন। যেহেতু তিনি এখনো অসুস্থ, তাই আরো চিকিৎসা-সেবা চান। আর মানসিক অবস্থা কিছুটা বিপর্যস্ত হওয়ায় মানসিক চিকিৎসা-সেবা নিতেও আগ্রহী। এছাড়া মেয়ের পড়াশোনার জন্য সাহায্য চান। আর সেলাইকাজে আরো দক্ষ হতে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী।

সমাজকর্মী হিসেবে সুপারিশ

একজন সমাজকর্মী হিসেবে তার প্রতি আমার সুপারিশ

- Rana Plaza Co-ordination Cell (RPCC)-এর সাথে যোগাযোগ রাখা।
- সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।
- চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া।
- প্রাপ্ত অর্থ বুঝেশুনে খরচ করা।

কেস স্টাডি-২

সাহায্যার্থীর পরিচিতি :

নাম	:	আলেয়া বেগম (ছদ্মনাম)
বয়স	:	৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	শুধু স্বাক্ষর করতে পারেন

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য

আলেয়া বেগমের এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে সংসার। রানা প্লাজার কোনো একটি গার্মেন্টসে কাজ করতেন। স্বামীর সাথে বনিবনা হয়নি বলে ৭ বছর আগে তালাক হয়েছে তার। দূর্ঘটনার আগে সাভারে বসবাস করতেন এখনো তিনি সাভারেই আছেন। রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় মাথা, ঘাড় ও পায়ে আঘাত পান তিনি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি দক্ষতা

আলেয়া বেগম বলেন, তিনি কখনো স্কুলে যাননি, শুধু নিজের নামটা লিখতে পারেন। গার্মেন্টসে কাজ করতেন বলে সেলাইকাজ জানেন। কিন্তু তার জন্য কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহন করেননি।

বর্তমান কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত তথ্য ও কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

তার দেওয়া তথ্য মতে, সাভারে রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একটি ছোট কারখানা রয়েছে। সেখানে তিনি কাজ করেন। কর্মক্ষেত্রে তার তেমন কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

স্বাস্থ্যসম্পর্কিত তথ্য

এই দুর্ঘটনায় তিনি শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতপ্রাপ্ত হন। মানসিকভাবে তিনি অনেক বিপর্যস্ত। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিয়মিতভাবে ফিজিওথেরাপি নিচ্ছেন। সেদিনের কথা মনে করে প্রায়ই কাঁদেন। একা থাকলে ভয় পান, ঠিকমতো কথা বলতে পারেন না। মুখে কথা জড়িয়ে আসে। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ কাজ করতে পারেন না, পায়ে যন্ত্রণা হয়। প্রায়ই ক্লান্তিবোধ করেন।

প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে পরিকল্পনা

প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের কিছু অংশ দৈনন্দিন জীবনযাপনে ব্যয় করেছেন। আর বাকি অর্থ ব্যাংকে রেখেছেন। তার মতে, যেহেতু স্বামী নেই সেহেতু প্রাপ্ত অর্থ সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য ব্যয় করবেন।

অন্যান্য সাহায্যপ্রাপ্তি ও প্রত্যাশিত সাহায্য

আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াও তিনি চিকিৎসা-সেবা পেয়েছেন। যেহেতু তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন, তাই চিকিৎসা-সেবা পেয়ে যেতে চান। এছাড়া ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য সরকারের কাছে সহযোগিতা চান।

সমাজকর্মী হিসেবে সুপারিশ

একজন সমাজকর্মী হিসেবে তার প্রতি আমার সুপারিশ:

- যেহেতু তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ, সেহেতু মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।
- ফিজিওথেরাপি চালিয়ে যাওয়া।
- প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগিয়ে নিজে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা।
- ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা।

কেস স্টাডি-৩

সাহায্যার্থীর পরিচিতি

নাম	: সুজন মিয়া (ছদ্মনাম)
বয়স	: ৩২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: ৫ম শ্রেণী
দুর্ঘটনায় মৃতের সাথে সম্পর্ক	: স্বামী-স্ত্রী

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য

স্বামী-স্ত্রী দুজনই রানা প্লাজায় কাজ করতেন, তবে আলাদা গার্মেন্টসে। দুর্ঘটনার দিন তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও স্ত্রীকে হারান। ঘটনার কয়েক দিন পর স্ত্রীর লাশ খুঁজে পান। রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় কাজ করেছেন উদ্ধারকর্মী হিসেবে। একটি মেয়েসন্তান আছে তার। সংসারে আরো আছে মা, বাবা, ভাই ও বোন। সংসার বাঁচাতে আবার বিয়ে করেন তিনি। দুর্ঘটনার আগে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে সাভারেই ঘর ভাড়া করে থাকতেন, কিন্তু দুর্ঘটনার পর চলে যান গ্রামের বাড়িতে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি দক্ষতা

৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও পড়াশোনার তেমন চর্চা নেই তার। এছাড়া তেমন কোনো কারিগরি প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেননি।

বর্তমান কর্মক্ষেত্র-সম্পর্কিত তথ্য ও কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমানে গ্রামে একটি ছোট্ট দোকান চালান কিন্তু এ কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এছাড়া এ কাজে আয়ও কম যা দিয়ে সংসার চলে না। তাই ভালো একটি চাকরির সন্ধানে আছেন। এক্ষেত্রে তিনি যে কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণেও প্রস্তুত।

স্বাস্থ্যসম্পর্কিত তথ্য

রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় অথবা উদ্ধারকর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে শারীরিক কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হননি তিনি। মানসিক কোনো ট্রমাও নেই তার। তবে দুর্ঘটনার কথা মনে পড়লে মাঝে মাঝে রাতে ঘুম হয় না। এছাড়া স্ত্রীর কথা মনে করেও খুব কষ্ট পান, তখন কাঁদেন।

প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে পরিকল্পনা

দুর্ঘটনায় স্ত্রীকে হারিয়ে এবং উদ্ধারকর্মী হিসেবে কাজ করে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান পান কিন্তু তাছাড়া অন্য কোনো পক্ষ থেকে আর কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাননি বলে তিনি দাবি করেন। প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকে রেখেছেন। তার অর্থ নিয়ে আপাতত তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তার অভিযোগ, দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় তাকে সাহায্য করা হয়নি।

অন্যান্য সাহায্যপ্রাপ্তি ও প্রত্যাশিত সাহায্য

আর্থিক অনুদান ছাড়া তিনি আর কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাননি। যদি তাকে যে কোনো একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তবে সে প্রশিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে তিনি তার ভবিষ্যৎ পকিল্পনা গ্রহণ করতে আগ্রহী।

সমাজকর্মী হিসেবে সুপারিশ

একজন সমাজকর্মী হিসেবে তার প্রতি আমার সুপারিশ:

* প্রাপ্ত অর্থের সঠিক ব্যবহার করা
* সন্তানের জন্য প্রাপ্ত অর্থ নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ না করে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য খরচ করা।
* উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

লেখক পরিচিতি

মোসা. মাহ্জুবা উম্মে ফেরদৌসী

মোসা. মাহ্জুবা উম্মে ফেরদৌসী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। এমএসএস কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি বিল্স-এ ইন্টার্ন করেন। তিনি তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন হিসেবে **"ক্ষুদ্রাকৃতির জিন্স পোশাক কারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থান ও অবস্থার উন্নয়নে করণীয় : কেরানীগঞ্জ, ঢাকা ভিত্তিক একটি গবেষণা"** প্রতিবেদনটির কাজ সম্পন্ন করেন।

রত্না বেগম

রত্না বেগম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। বিএসএস (সম্মান) শেষ বর্ষে অধ্যয়নের সময়ে কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি বিল্স-এ ইন্টার্ন করেন। তিনি তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন হিসেবে **"বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার বর্তমান অবস্থা ও করণীয়"** প্রতিবেদনটির কাজ সম্পন্ন করেন।

হাসান আল আব্দুল্লাহ

হাসান আল আব্দুলল্লাহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।এমএসএস কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি বিল্স-এ ইন্টার্ন করেন। তিনি তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন হিসেবে **"আদিবাসী মেয়েদের বিউটি পার্লারে আগমন, তার কারণ এবং বর্তমানে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা"** প্রতিবেদনটির কাজ সম্পন্ন করেন।

সৈয়দ মোশারফ হোসেন

সৈয়দ মোশারফ হোসেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী। এমএসএস কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি বিল্স-এ ইন্টার্ন করেন। তিনি তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন হিসেবে **"চা শিল্প কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মজীবন (আর্থ-সামাজিক)"** প্রতিবেদনটির কাজ সম্পন্ন করেন।

কাওসার হোসাইন

কাওসার হোসাইন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২০০৫- ২০০৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। বিএসএস সম্মান ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নের সময়ে কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি বিল্স-এ ইন্টার্ন করেন। তিনি তার ব্যবহারিক প্রতিবেদন হিসেবে **"গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষঃ কারণ, প্রভাব ও উত্তরণের উপায় : একটি সমীক্ষা"** প্রতিবেদনটির কাজ সম্পন্ন করেন।

মো. আরিফুর রহমান

মো. আরিফুর রহমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। বিএসএস (সম্মান) ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নের সময়ে কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি বিল্‌স-এ ইন্টার্ন করেন। তিনি তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন হিসেবে **"কাঠশিল্প শ্রমিকদের উপর পরিচালিত গবেষণা"** প্রতিবেদনটির কাজ সম্পন্ন করেন।

কানিজ ফাতেমা খান

কানিজ ফাতেমা খান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। বিএসএস (সম্মান) ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নের সময়ে কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি বিল্‌স-এ ইন্টার্ন করেন। তিনি তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন হিসেবে **"ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শ্রম অধিকার সচেতনতা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা"** প্রতিবেদনটির কাজ সম্পন্ন করেন।

শারমিন আক্তার

শারমিন আক্তার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৯-২০১০ শিক্ষবর্ষের শিক্ষার্থী। বিএসএস (সম্মান) ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নের সময়ে কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি বিল্‌স-এ ইন্টার্ন করেন। তিনি তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন হিসেবে **"Vulnerability Assesment And After Award Services For Rana Plaza Survivors And Their Family Members"** প্রতিবেদনটির কাজ সম্পন্ন করেন।